দুনিয়ার দেনা

শ্রীহেমলতা দেবী
প্রণীত

মূল্য ।১০ আনা

সূচী

বোঝা-বওয়া	১
ফকিরের ফাঁক ...	১০
দশের দোসর ..	২৬
পথের মানুষ	৩৫
কাপালিকের কপাল	৫৪
সাঁঝের পাড়ি	৯১
দুনিয়ার দেনা	১২৪

প্রকাশকের নিবেদন

গ্রন্থকর্ত্রী বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিতা নহেন। এ পর্যান্ত তাঁহার যে সকল রচনা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাদের একটা বিশেষত্ব এই যে সেগুলির মধ্যে কোনটাই অহেতুক উচ্ছ্বাসে পূর্ণ নয়। তাঁহার রচনা মাত্রেই চিন্তা করিবার বিষয় থাকে। এই পুস্তকখানিতেও গ্রন্থকর্ত্রীর সেই বিশেষত্বটি অক্ষুণ্ণ আছে। ইহার সরস গল্পগুলির হাসিকান্নার মধ্যে পাঠক অনেক চিন্তা করিবার বিষয় পাইবেন,---অথচ সেগুলি স্কুলপাঠ্য পুস্তকের নীতিমূলক গল্পের মত নয়। বাংলা ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক নাই বলিলেই চলে। এই জন্য পুস্তকখানি আমাদের কথা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করিবে মনে করি। পুস্তকের প্রচ্ছদপটখানি সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়ের পরিকল্পিত। এই সুযোগে তাঁহাকে গ্রন্থকর্ত্রীর তরফ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

শান্তিনিকেতন,
কার্ত্তিক, ১৩১৭।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

দুনিয়ার দেনা

বোঝা-বওয়া

১

বাড়িটি আমার পথের ধারেই। রাত্রি-দিন পথ দিয়ে পথিকেরা যাতায়াত করে আর আমি ব'সে ব'সে দেখি। ভাবি, এরা কোথায় যায়, কেন যায় কেন আসে!

আমার প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। ছত্রিশ বৎসর হ'য়ে গেল এ প্রশ্নের মীমাংসা হ'ল না। সেই এক ভাবেই দিন কাটে। সেই পথের দিকে চেয়ে থাকা, পথ দেখা ও পথিক গোণা।

আমি বেকার, দিন-রাত্রির মধ্যে কোন কাজ নেই। পাড়ার লোকে বলে,—ওহে বিবাহ কর, সংসারী হও, এমন করে ক'দিন যাবে? আমি বলি সংসার আমাকে ডাক্‌ল কই? আমি ত তার পথের ধারে দিন-রাত্রি বসেই আছি, সে তো আমাকে একটিবারও ডাকেনি।

তারা কথা শুনে অবাক্ হয়, ভাবে লোকটা বলে কি!

সত্যি সত্যি সংসার আমায় একটাবারও ডাকে নি। একটি কাজও তার জন্যে করতে বলে নি। ডাক্ না পেলে যাই কি ক'রে এ কথাটা কেউ বোঝে না! সৃষ্টি-ছাড়া কাজের কথা সৃষ্টির অদ্ভুত জীব না হ'লে জানবেই বা কে!

কর্ম্মব্যস্ত লোকদের দ্রুত পথে চ'লতে দেখে কত সময় ইচ্ছা হ'য়েছে আমিও ওদের সঙ্গে যাই, ওদের মত কাজ করি, কিন্তু সে ইচ্ছায় গতি নেই আনন্দ নেই, তবে যাই কি ক'রে।

এই অকর্ম্মণ্য জীবটা যখন গতিশূন্য হ'য়ে এমনি ভাবে দিনের পর দিন কাটাচ্ছে তখন একদিন হঠাৎ তার ডাক প'ড়ল—"বোঝাটা নামিয়ে দাও তো বাবু"। ঘর্ম্মাক্ত দেহে প্রকাণ্ড এক মোট নিয়ে একটা ঝাঁকা মুটে পথে চ'লতে চ'লতে আমার দিকে চোখ প'ড়তেই ব'লে উঠল, "বোঝাটা নামিয়ে দাও তো বাবু"।

বোঝা নামালুম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিজের মোট নিয়ে মুটে গেল—চ'লে তার নিজের পথে, কিন্তু যে ডাক আমাকে ডেকে গেল তার আর শেষ হ'ল না।

সেই দিন থেকেই আমার কাজের সুরু।

২

প্রতিদিন খুব ভোরে, প্রায় রাত্রি চারটার সময় উঠে বড় রাস্তার চৌমাথায় গিয়ে আমি দাঁড়াতে আরম্ভ করলুম। পথ দিয়ে যে কোনো পথিক যায়, যার হাতে বেশী বোঝা দেখি তার কতকটা বোঝা নামিয়ে নিয়ে তাকে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসি। এই আমার কাজ।

এইটুকু কাজ ক'রেই আমি বেশ সুখে আছি, মনের কোনখানে কোন কষ্ট কোন অভাব নেই।

প্রতিদিনই ঐ ভাবে আমি কাজ ক'রে চলেছি। ভোর থেকে বেলা বারটা পর্য্যন্ত আমার রাস্তায় রাস্তায় কাটে। বারটার পর বাড়ী এসে নেয়ে-খেয়ে বিশ্রাম করি। বিকাল পাঁচটায় আবার গিয়ে চৌ-মাথায় দাঁড়াই, সামনে পথিক পেলেই তার বোঝা নামাই ও ব'য়ে নিয়ে যাই!

ভদ্রলোক পথিকেরা সময়ে সময়ে আমার উপর সন্তুষ্ট হ'য়ে কেউ দু'আনা, কেউ চার আনা, বকসিস দিতে আসেন। আমি বলি,—মশায় ক্ষমা করবেন, এটা আমার ব্যবসা নয়, নিজের পরিতৃপ্তির জন্যই এটা আমি ক'রে থাকি। কতকটা সহজে কতকটা স্বচ্ছন্দে আপনারা যে গম্য স্থানে পৌঁছবেন, এতেই আমার সুখ আমার আনন্দ। আপনারা বিশ্রাম করুন' আমি ফিরে চললুম।

আমার কাণ্ড দেখে কেউ বলে লোকটা পাগল হে. কেউ বলে বেটার নিশ্চয়ই কোন মতলব আছে, পাঁচ দিন সাধুগিরী দেখিয়ে এক দিন কারো ভাল রকম মাল হাতে পেলে নিশ্চয় চম্পট দেবে, এ যদি না হয় ত কোন শক্ত রকম পাপ ক'রেছে, শেষে অনুতপ্ত হ'য়ে এইভাবে তার প্রায়শ্চিত্ত সাধন ক'রছে, লোকটাকে ভাল বলেই বোধ হয়। যে যা বলে বলুক আমি প্রতিদিন এই ভাবে কাজ ক'রে বাড়ী এসে সুখে নিদ্রা যাই।

৩

আমার কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। তাই আমার খাওয়া-পরার কোন ভাবনা ছিল না। নিশ্চিন্ত মনে তাই আমি কেবল রাস্তায় রাস্তায় বোঝা ব'য়ে দিন কাটাতে পারতুম। প্রত্যেক বেলা বাড়ী থেকে বার হবার সময় আমি একটি ক'রে টাকা সঙ্গে নিয়ে যেতুম, ফেরবার পথে তাই দিয়ে নানা রকম খাবার জিনিষ কিনে এনে বাড়ী এসে পাড়ার ছেলেদের ডেকে খাওয়াতুম এতেই আমার বোঝা-বওয়ার শ্রান্তিটুকু হেলায় দূর হ'য়ে অবকাশ-টুকু, ফাঁকটুকু আনন্দে ভ'রে উঠত।

ছেলেদের সঙ্গে সেই থেকে আমার এমন একটা যোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল যে, তারা নইলে আমার চলে না, আমি

নইলে তাদের চলে না। আমার ঘরের সর্ব্বস্ব তাদের আর তাদের সব যেন আমার হ'য়ে পড়েছিল।

৪

দৈনিক বোঝা-বওয়া কাজটীর মধ্যে একদিন এক পথিকের বোঝা ব'য়ে দিতে তিনি আমাকে এক টুকরী ফল উপহার দিলেন। ফল পেয়ে আমি বড় খুসী হলুম। এ রকম পুরস্কার আর কোন পথিকের বোঝা ব'য়ে আমি কোন দিন পাই নাই। ফলগুলো পেয়ে ভাবলুম, ছেলেরা আজ ফল পেয়ে বড় খুশী হবে।

ছেলেদের মুখ মনে পড়াতে ফলের দিকে চেয়ে আমার মনে কেমন একটা আনন্দ হ'ল। বুঝলুম এ রকম উপহার নেওয়া যেতে পারে।

মাসখানেক পরে দেখি, সেই পথিক আবার এক মস্ত বোঝা নিয়ে চৌমাথার রাস্তা ধরে চলেচেন। আমি দৌড়ে বোঝাটা নামিয়ে নিতে গেলুম, পথিক ব'ল্লেন, আজকের বোঝাটা বড় বেশী ভারী, তুমি বইতে পারবে না। আমি অত্যন্ত অনায়াসে বল্লুম, কোন চিন্তা নেই, বোঝা যত ভারী হবে আমার আনন্দ তত বেশী, তৃপ্তি তত পরিপূর্ণ হবে। দিন্ বোঝা আমার কাঁধে, চলুন আপনি।

বোঝাটা নামিয়ে নিতে নিতে আমি বল্লুম, "মশায় যে

বোঝা আপনি নিয়ে চলছিলেন সেটা নিয়ে আমি চ'লতে পারব না এমনটা ভাবলেন কি ক'রে ?"

পথিক বল্লেন, "ওহে তুমি বোঝো না, এটা যে আমার নিজের বোঝা, যেমন ক'রেই হোক একে যে আমার বইতেই হবে, তুমি পরের এত বড় বোঝাটা বইবে কেমন ক'রে তাই ভাবছিলুম"। শুনে বুঝলুম, আমার ডাকের খবর তিনি রাখেন না।

সেই সদাশয় পথিকের বোঝাটি নিয়ে তাঁকে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে আগের দিনের মত তিনি আমায় আবার এক ঝুড়ি ফল দিলেন। ফলের বোঝা খোকাদের জন্যে ব'য়ে নিয়ে বাড়ী এলুম। ফলগুলো নামিয়ে দেখি, টুকরীর মধ্যে আজ এক তোড়া মোহর। ভাবলুম পথিক ভুল ক'রে মোহরের তোড়াটা এর মধ্যে ফেলে রেখেছেন। যাই হোক্, কাল থেকে আবার এই মোহরের বোঝা নিয়ে আমাকে রাস্তায় আনা-গোনা করতে হবে দেখছি। কর্ম্মভোগ আর বলে কাকে ? যত দিন আবার না সেই পথিকের দেখা পাচ্ছি, তাঁর মোহরের তোড়াটি তাঁকে যতদিন ফিরিয়ে দিতে না পারছি, তত দিন এই সোণার বোঝা বওয়া আমার আর একটা কাজ হ'ল দেখছি।

প্রায় মাস ছয়েক পরে পথিকের দেখা পেলুম। সেইভাবে পথিক আবার পথ দিয়ে যাচ্ছেন। বল্লুম, "মশায়,

ছ'মাস ধ'রে আপনার এই মোহরের বোঝা ব'য়ে ফিরচি, নিন্ আপনার মোহরের তোড়া"।

পথিক একটু অবাক্ হ'য়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন —বোধ হয়, যেন ভাবলেন লোকটা কি প্রকৃতির মানুষ!

তোড়া নিয়ে পথিক নিজের গন্তব্য পথে চ'লে গেলেন আমি ও বাড়ী ফিরলুম।

সে দিন আর তাঁর মোহরের বোঝা নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে যাই নি। সে বোঝা অনেক দিন ধ'রে বয়েছিলুম ব'লে আর বইবার ইচ্ছা ছিল না। তা ছাড়া পথিকের হাতে এবার আর অন্য বোঝা না থাকায় নিজের সোণার বোঝা তিনি অনায়াসে ব'য়ে নিয়ে যেতে পারবেন জানতুম।

৫

দিন দুই পরে একটী লোক এসে আমায় ব'লল দেশের রাজা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি ত শুনে অবাক্! রাজা আমাকে ডেকেছেন, কি আশ্চর্য্য। রাজার আমায় কি দরকার? শেষে ভাবলুম, হয় ত বা সেখানেও বোঝা বইবার জন্যে কোন বেকার লোকের দরকার আছে।

যাই হোক্, আমি ত রাজ-সদনে যাত্রা ক'রলুম। গিয়ে দেখি, মহারাজ সিংহাসনে ব'সে—তিনিই আমার সেই সোণার তোড়া-ওয়ালা সদাশয় পথিক।

দেখে প্রথমটা আমি চমকে গিয়েছিলুম, ভাবলুম, না জানি কপালে কি আছে। পরে তিনি ব'ল্লেন, আমি তোমার সততায় বিস্মিত ও মুগ্ধ হ'য়েছি। তুমি আর রাস্তার লোকের বোঝা ব'য়ে দিন কাটিও না, আমার রাজ্যের কোন একটা উচ্চ বেতনের কর্ম্মভার গ্রহণ ক'রে আমাদের সকলকে সুখী ও আনন্দিত কর।

তখন আমি বুঝলুম,ব্যাপারটা কি ? বল্লুম, "মহারাজ আমার ত কাজ ক'রে বেতন নেবার যো নেই, আমি যে আমার ভক্তির আজ্ঞায় কাজ করে থাকি। বেতন নিলেই আমি মারা প'ড়ব। মহারাজ ওটা আমার দ্বারা হবে না"।

রাজা বল্লেন, "তবে তুমি বিনা বেতনেই আমার কোন একটা কাজ গ্রহণ কর। নতুবা আমরা সুখী হ'তে পারছি নে"।

"তাই হবে মহারাজ, কাল থেকে আমি প্রতিদিন আপনার দরবারের বড় দরওয়াজায় উপস্থিত থাকব, যে কেউ রাজদর্শনে আসবে তার সঙ্গে যদি কোন বোঝা থাকে তাই নামিয়ে নেওয়ার ভার আমার উপর রইল। আপনি যখন আমাকে নিজের মধ্যেই আটক রাখতে চাইছেন তখন এই কাজটুকু নিয়েই আমি নিজকে এখানে বেঁধে রাখব। বাঁধার মধ্যে আমার ঐটুকু ফাঁক, ঐ বোঝা-নামাটুকু দেখাতেই আমার আনন্দ।"

রাজা বল্লেন "তাই হবে"।

সেই থেকে বড় রাস্তার চৌমাথা ছেড়ে দিয়ে প্রতিদিন আমি রাজ-দরবারে হাজির থাকি! যে আসে, যে দরবারে ঢুক্‌তে যায় তার বোঝা নামাই। এতে আমার শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই, শুধু কেবল তৃপ্তিই আছে।

দীর্ঘকাল পরে, প্রায় বিশ বৎসর ধ'রে একই ভাবে কাজ ক'রতে দেখে রাজা এক দিন আমাকে ডেকে বল্লেন "কি হে বাপু, তুমি নিত্যি নিত্যি পরের বোঝা নামিয়ে কি সুখ পাও বল ত?"

আমি বল্লুম, "মহারাজ, যখন বাড়ী ফিরি তখন এমন এক অগাধ শান্তির মধ্যে ডুবে যাই, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না। আমার সেইটাই পাওয়া।"

রাজা আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। জানি না, আমার চোখের ভিতর দিয়ে তিনি শান্তির কোন রূপ ও ভক্তির কোন বিগ্রহ আমার মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন কি না। আমি কিন্তু সেই দিন থেকে তাঁর রাজ-দরবারের বড় দরজার সামনে হাজির থাকার বাঁধা নিয়ম থেকে অব্যাহতি পেয়েছি। এখন আমি নিজের ইচ্ছামত রাজ-দরবারের দরওয়জায় গিয়ে দরবারী লোকের বোঝা নামাই, কখনো রাস্তার চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সাধারণ পথিকদের বোঝা বই—যেমন আমার খুসী।

ফকিরের ফাঁক

১

প্রসাদপুরের রাজা মানুষটি এক নতুন রকমের জীব। বাপের মৃত্যুর পর, কোথায় রাজা হবেন—না রাজ্যটি প্রজাদের দান করে বসলেন। মন্ত্রীদের কত উপরোধ, অনুরোধ, প্রজাদের কত কাকুতি-মিনতি কিছুতেই তাঁর মন ফেরাতে পারল না।

রাজা হয়ে তিনি রাজ্যে বাস করবেন না, এই তাঁর মতলব। সঙ্কল্প থেকে কোনক্রমে তাঁকে না টলাতে পেরে, সকলে মিলে একজোট হয়ে এসে তাঁকে বল্লে, আপনি রাজা না থাকুন আমাদের সকল কাজের মধ্যে আপনাকে কিন্তু যুক্ত থাকাতেই হবে, তা না হলে আমরা ছাড়ব না। রাজা বল্লেন, বেশ।

পরদিন থেকে রাজাহীন রাজ্য প্রজাদের দ্বারা পরিচালিত হতে লাগল। রাজা তাদেরই মধ্যের একজন হয়ে রাজ্যের কাজে দিন রাত্রি পরিশ্রম করতে লাগলেন কিন্তু রাজা রইলেন না।

তাঁর নাম ছিল দেবব্রত। সকলে এখন থেকে তাঁকে দেবদূত বলেই ডাকতে লাগল

২

শোনা যায় দেবদূতের বয়স যখন সতের তখন নাকি তিনি নৌকা চড়ে একদিন নদীতে বেড়াতে যান। ঝড়ের মুখে পড়ে মাঝ নদীতে নৌকাডুবি হয়। একটি প্রাণীও বেঁচে ফেরে নাই। দলবল সহ দেবদূতের মৃত্যু হয়েছে স্থির করে নেওয়া হয়।

তিন বৎসর পরে হঠাৎ একদিন একখানি ভাঙ্গা নৌকায় চড়ে নদীপথে দেবদূত বাড়ী ফিরে আসেন।

এ তিন বৎসর কোথায় ছিলেন কি ভাবে ছিলেন কেউ তা জানে না, জিজ্ঞাসা করতেও কেউ সাহস করেনি। তাঁর পিতা ভূতপূর্ব্ব মহারাজা জানতেন কি না তাও জানা যায়-নি। কিন্তু তখন থেকে রাজকুমার দেবদূতের একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটেছে।

মহারাজের সকল কাজেই তিনি যোগ দেন কিন্তু রাজ-প্রসাদে থাকেন না। নদীতীরে একটি কুটীর তৈরি করে তাতেই বাস করেন। সাধারণ খাবার খান, সাধারণ পোষাক পরেন, ঝি চাকর একজনও সঙ্গে রাখেন না। নিজের কাজ সব নিজেই করে থাকেন।

রাজা তাঁর এ ভাবটা বদলাবার অনেক চেষ্টা করে-

ছিলেন সফল হননি। শেষে তাঁকে নিজের ইচ্ছামতই চলতে দিয়েছিলেন।

দেবদূতের একটি মাত্র সখ্ ছিল প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজ্যের একদল করে লোক নিয়ে নৌকা চড়ে নদীতে বেড়ান।

একদিন শিশুদের, একদিন বালক বালিকাদের, একদিন যুবাপুরুষদের, একদিন বৃদ্ধবৃদ্ধাদের, একদিন অন্ধ আতুর-দের, ও একদিন সন্ন্যাসী সাধু ফকিরদের নিয়ে তিনি যান। আর একটি দিন রাখেন যার খুসী সে যেতে পারে বলে।

সারাদিন পরিশ্রমের পর এই একটি আনন্দময় ব্যাপার ছিল তাঁর নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যে।

দেবদূতের কাণ্ডকারখানা দেখে লোকে তাঁকে রাজা ভাববে কি প্রজা ভাববে, আমীর ভাববে কি ফকির ভাববে বুঝেই উঠতে পারে না।

ফুলের প্রতি তাঁর বড় আদর। নিজের কুটীরের পাশে তিনি এক মস্ত ফুলের বাগান তৈরী করেছেন। সে বাগানের সকল কাজ তাঁর নিজের। গাছগুলি সব নিজের হাতে বসানো। নিজের পরিশ্রম ও যত্নের গুণে এই সকল গাছে প্রতিদিন তিনি রাশি রাশি ফুল ফুটিয়ে তোলেন।

দূর থেকে কত লোক এই বাগান দেখতে আসে ও দেখে পুলকিত হয়ে ফিরে যায়।

নৌকা থেকে ফিরে এসে ঘরে বাতি জ্বালানর সঙ্গে

একটি করে সুন্দর ফুল প্রতিদিন দেবদূত নদীতে ভাসিয়ে দেন। কেউ জানেনা কেন।

৩

একদিন দুপুর রোদে দেবদূত বাগানে মাটি কোপাচ্ছেন এমন সময় এক বুড়ী এসে বল্‌ল বাবা আমার ছেলে আমাকে খেতে দেয় না, বাড়ী থেকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুনে তিনি বুড়ির সঙ্গে তৎক্ষণাৎ তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। ছেলেকে ডেকে বল্লেন "মাকে খেতে দাওনি কেন?" ছেলে বল্লে "আমার যা আছে তাতে সংসার চলে না, তার উপর মা ঝগড়াঝাঁটি চেঁচামেচি করে বাড়ী মাথায় করে তোলে, আর জ্বালাতন সইতে না পেরে রাগ করে মাকে বকেছি, তাই আপনার কাছে গিয়ে নালিশ করেছে।" দেবদূত বল্লেন "তুমি কি কাজ কর"? ছেলে বল্লে কোন কাজ করিনা ঘরে বসে থাকি"

দেবদূত বল্লেন, "অলসব্যক্তির বাড়ী ঘর জমিজমা টাকাকড়ি সব সরকার বাজেয়াপ্ত করবে আজ থেকে এ রাজ্যে এই নিয়ম হল"।

এই শুনে বুড়ীর ছেলে দেবদূতের পায়ে প'ড়ে কান্নাকাটি করতে লাগল। মাকে এখন থেকে যত্নে ভরণপোষণ করবে ও কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা আগামী কাল

থেকেই অর্থোপার্জ্জন আরম্ভ করবে বলে বারবার শপথ করতে লাগল।

দেবদূত তাকে ছেড়ে দিলেন কিন্তু বাড়ী ফিরে প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যময় এই নিয়মজারী করলেন যে, যে কেউ বিনা পরিশ্রমে অলস হয়ে দিন কাটাবে, খবর পাওয়া মাত্র, তার সমস্ত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হবে। সকলে এ আদেশ মাথা পেতে স্বীকার করে নিল।

দেবদূতের গায়ে ছিল অসুরের বল। বার ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে তিনি আবার তখুনি ফিরে আসতে পারতেন। একমন বোঝা অনায়াসে বয়ে দুই ক্রোশ পথ চলে যেতেন।

একদিন রাত্রে দেবদূত ঘুমোচ্ছেন দুজন চোর এসে তার কুটীরে সিঁদ কেটে ঢুকেছে। একটুখানি শব্দ হতেই তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠেই দুহাতে চোর দুজনকে জাপটে ধরে বল্লেন কি চাস? আমার কি সোনা দানা আছে যে তোরা চুরী করতে এসেছিস? ঘটি বাটি যা আছে তাত চাইলেই পেতিস, তার জন্যে সিঁদ কাটা কেন? ঐ যা দুচার খানা কাপড় চোপড় আছে তাই নিয়ে চলে যা। আর কখনো চুরী করিসনে, খেটে খাগে তাহলে রাতে আরামে ঘুমিয়ে বাঁচবি। ঘুমন্ত লোকটা এমন করে ঘুমে ঘুরে মারিসনে।

৪

চোর দুজন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে গেল এক টুকরা ছেঁড়া ন্যাকড়াও সঙ্গে নিয়ে গেল না।

এইভাবে দেবদূতের দিন কাটে। কোনদিন তাঁর কোন কাজের একচুল ব্যতিক্রম হয় না। সেই সারাদিন পরিশ্রম, সন্ধ্যায় নৌকা চড়া, ফিরে এসে ফুলটি ভাসান ও শেষে স্বপাক অন্ন খেয়ে রাতে নিদ্রা যাওয়া।

বয়স যখন তাঁর সত্তর একদিন এক নূতন ঘটনা ঘটল। সন্ধ্যার সময় নৌকা নিয়ে দেবদূত ঘাটে বসে আছেন কালো মেঘে আকাশ পৃথিবী সব ঢেকে গেছে মুহূর্তের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি নামল। কোলের মানুষ দেখা যায় না এমনি অন্ধকার, আকাশ ভেঙ্গে পড়ে এমনি জোর বৃষ্টির ধারা।

একটি মানুষও আজ নৌকায় যাবার জন্যে এল না। আজ যার খুশী তার যেতে পারার দিন।

দেবদূত ঘাটের কিনারায় বসে আছেন, নড়েন না।

কিছুক্ষণ পরে সেই ঝড় বাদল মাথায় করে এক ফকির ঘাটে এসে উপস্থিত। তিনি দেবদূতকে জিজ্ঞাসা করলেন "আজ নৌকাযাত্রা হবে না"?

দেবদূত বল্লেন "হবে বই কি, এই আপনার জন্যেই অপেক্ষা।"

খুসী হয়ে ফকির বল্লেন "চলুন তবে নৌকায় ওঠা যাক।"

দুজনে নৌকায় চড়লেন। জল ঝড়ের মুখে নৌকা ভেসে চল্‌ল। বৃষ্টির জোর যত বেশী ছিল ঝড়ের তত নয়! তাই কোন রকমে নৌকাখানা এগোতে লাগল।

উভয়েই নিস্তব্ধ। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ফকির বলে উঠলেন "দেবদূত আজ এই অন্ধকারটা আমার বুকের উপর বড় বেশী করে চেপে ধরছে, তার উপরে এই ঝড় বাদল আমার বুকের মধ্যে কেমন একটা তুফান তুলছে, আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন না করে থাকতে পারছি নে। তুমি বল তোমার জীবনের রহস্য আমাকে। তোমার জীবনের রহস্যটি ভাঙলে আমার বুকের এই অন্ধকারের চাপ সরে গিয়ে যেন একটু আলো দেখা দেবে, যেন আমি হাল্কা হয়ে বাঁচব আমার মনে হয়"।

দেবদূত বল্লেন "এতে যদি তোমার উপকার হয়, তোমার বুকের বোঝা এতে যদি নেমে যায় তবে শোন আমার কাহিনী! এই বলে দেবদূত নিজের পূর্ব্বকথা বলতে আরম্ভ করলেন—

"সতের বছর বয়সে, বাপের আদরের ধন, বংশের একমাত্র সন্তান, রাজ্যের আশা ভরসা স্থল আমি ডুবে মরেছি জেনে রাজ্যময় যখন হাহাকার পড়ে গিয়েছিল, আমি তখন নদীর তলে তলিয়ে অচেতন। কোথায় কদিন

ছিলুম জানিনে। জ্ঞান হলে চোখ মেলে দেখি মাথার উপর সূর্য্য-কিরণ ঝলমল করছে। একদিকে নদী কলকল শব্দ বয়ে চলেছে, আর একদিকে দূর দিগন্ত পর্য্যন্ত সবুজ ঘাসে ঢাকা।

কোথায় অন্ধকারময় নদীগর্ভে জলের তলে অচেতনে তলিয়ে যাওয়া, আর কোথায় খোলা আকাশের নীচে ঝলমলে আলোর মধ্যে, হাল্কা বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া।

স্বপ্নের মত দুটো ঝাপসা অনুভূতি একত্র হয়ে মাথাটা আমার গুলিয়ে দিলে।

জানিনে কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছে! চেয়ে দেখি মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুল, হাটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড়, বড় বড় চোখ, শ্যামবর্ণ, জোয়ান চেহারার একটি মানুষ, আমার মুখের মধ্যে কি ঢেলে দিচ্ছে। তারই পাশে একটি ছোট্ট মেয়ে, বয়েস নয় কি দশ, দেখতে পরীর মত আমারই মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে বেঁচে উঠতে দেখে মেয়েটির চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল; হাততালি দিতে দিতে, সামনের রাস্তা ধ'রে সে ছুটে চল্‌ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা ছেঁড়া কম্বল এনে তাই দিয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিলে

আমি চোখ বুজলুম। ক্লান্তিতে আমার শরীর অবসন্ন।

মনে হল যেন ঘুম আসছে। আধঘুমে বুঝলুম সেই জোয়ান লোকটি আমাকে তুলে কাঁধে ফেলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

হঠাৎ তারা থামল। ভারী গলায় পুরুষটি হেঁকে বলল "মইনু এগিয়ে দরজা খোল"। দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তখন আমার তন্দ্রা একটু ছুটেছে। পরক্ষণেই একটা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে, একটা পায়া ভাঙ্গা খাটিয়ার উপরে আমি শুয়ে আছি বুঝলুম।

ঘুম, খুব ঘুম, এমন ঘুম আর কখনো ঘুমোইনি। যখন জাগলুম দেখি মন বুদ্ধি অনেকখানি তাজা হয়েছে কিন্তু সর্বাঙ্গে ব্যথা হাত পা নাড়ারবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

৫

কএকদিন বাস করতেই জানলুম এরা দুটি বাপ ও মেয়ে, জাতে এরা জেলে, নদীতে মাছ ধরে সেই মাছ গাঁয়ে বেচাই বাপের ব্যবসা। ছোট্ট মেয়েটি ঘরকন্নার সব কাজ করে। রাঁধা বাড়া, ঘর উঠান ঝাঁট, একটি দুধালী ছাগল আছে তাকে চরান, বাপকে প্রাণ দিয়ে যত্ন করা, স্নানের সময় তেল মাখানো, নেয়ে এলে গরম গরম ভাত মাটির থালায় বেড়ে সামনে বসে খাওয়ানো। আমিত দেখে অবাক্। এতটুকু মেয়ের কাজের কি শৃঙ্খলা, প্রতি কাজে কি প্রাণের টান!

আর কি সুন্দর তার হাওয়ার মত হাল্কা চলা ফেরা, হাত পা নাড়ার ভঙ্গী।

আমার সেবার ভার পড়েছে এখন সেই মেয়েটির উপর। ফুলের মত মেয়েটি যখনই আমার কাছে আসে আমার চারিদিকে যেন ফুল ফুটে ওঠে। তার সবই যেন ফুলের মত। মুখখানি ফোটা ফুল—হৃদয়টি তারই সুগন্ধে ভরা। এমনতর সহজ, সুন্দর, স্নিগ্ধ, কোমল পরিপূর্ণ বস্তু কখনো দেখিনি। মানুষ যে কত সুন্দর হতে পারে এই প্রথম আমি তা দেখলুম।

তাদের খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ সিদ্ধ, তাতে তেল নুন মাখা। আর চাক ভাঙ্গা মধু, যত চাও। সময়ে সময়ে দু'চারটে বুনো ফলও মইনু পেড়ে আনত।

ছাগলী যা দুধ দেয় আজকাল আমিই তার সবটুকু পাই—রুগ্ন বলে।

তাদের যত্নে মাস দুয়েকের মধ্যেই আমি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলুম। ভাবি এইবারে বাড়ী যাব—যদিও জানিনে বাড়ী এখান থেকে কত দূরের পথ। কিন্তু এদের ছেড়ে যেতে মন একেবারেই চায় না—বিশেষত মইনুকে। মইনু, সে যে আগাগোড়াই ফুলের সুবাসে ভরা, সে যে দেবলোকের একটি মাত্র সাদা পারিজাত।

ভাবি আজ যাব, কাল যাব, এমনি করে তিনমাস কাটল যাওয়া হল না। মইনুর বাপের নাম সূর্তি, সবাই

তাকে সৃত্তি জেলে বলে। একদিন আমি বল্লুম "সৃত্তি আমিও তোমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাব, তোমার উপর বসে বসে আর কত খাই ?" সৃত্তি বল্লে "বেটা তোর ননীর দেহ তুই মাছ ধরতে পারবি ক্যানে ?"

আমি বল্লুম "খুব পারব তুমি নিয়েই চল না" "আচ্ছা কালকে যাস". এই বলে সে কাঁধে জাল ফেলে চলে গেল। রোজ যেমন নৌকা চড়ে যায়, এদিনও সে তেমনি গেল কিন্তু বেলা যায় সন্ধ্যা হয় আজ আর সৃত্তি ফেরে না। রাত্রি হল সৃত্তির দেখা নেই। সারারাত মইনু আর আমি দাওয়ায় বসে—সৃত্তি আসে না। ভোরের সময় প্রতিবেশী জেলে সিন্দি এসে বল্লে "মইনু তোর বাপ কাল মরেছে মাথায় বাজ পড়ে। সঙ্গে আমি ছিনু ট্যাঁক থেকে তার সাতগণ্ডা পয়সা খুলে এনেছি তোর জন্যে, এই নে" বলে পয়সাগুলো সিন্দি দাওয়ার উপর ছড়িয়ে দিলে।

বাপের মরা খবর শোনামাত্র মইনু জ্ঞানশূন্য হয়ে দাওয়া থেকে নীচে উল্টে পড়ে গেল। চোখে মুখে জল দিতে দিতে জ্ঞান ফিরে এলে তাকে ঘরের মধ্যে আমি তুলে শোয়ালুম।

কি তার কান্না! দিন রাত্রি কেঁদে কেঁদে তিনদিনের মধ্যে মইনু শুকিয়ে যেন এতটুকুটি হয়ে গেল। প্রাণপণ চেষ্টায় একটু করে ছাগল দুধ ও একটুখানি মধু এই তাকে খাওয়াতে পেরেছিলুম। তিনদিন পরে সে একটু

শান্ত হল। তখন আমাকে আর একেবারেই ছাড়তে চায় না। সেই দশ বছরের মেয়ে মইনু যেন আমার কণ্ঠের হার হয়ে আমার বুকে ঝুলতে লাগল, তাকে ফেলে যাই কোথা ?

সৃত্তির জন্যে আমার প্রাণেও বড় কান্নাটাই জেগেছিল। মইনুর জন্যে সেটা আমি চেপে রেখেছিলুম। আমি কাঁদলে তার শোক উথলে উঠবে। সৃত্তি আমাকে বাঁচাল, এ প্রাণটা এক রকম তারই দেওয়া, কিন্তু তার বদলে সে আমার কাছ থেকে, আমার রাজা বাপের কাছ থেকে, কোন পুরস্কার না নিয়েই চলে গেল। সে জানল না যে সে এক রাজপুত্রকে বাঁচিয়েছে তার অনেক দাবী, অনেক পাওনা। তাকে যে আর কখনো মাছ ধ'রে খেতে হবে না এ কথা সে শুনে গেল না। হায় হায় কি দুঃখ! যাই হোক্ এর কিছু প্রতিদান তো আমাকে দিতেই হবে। তার মইনুকে চিরজীবন আমার গলায় গেঁথে রাখতেই হবে। তাতে যাই হোক্।

একেই মইনু আমার চোখের সামনে, হৃদয়ের সামনে ফুলের মত ফুটে থাকে তার উপর এই কৃতজ্ঞতা তার কাছে যেন আমাকে বিকিয়ে দিল। আমার সবটা এখন তারই।

মইনুর বাপের একখানা ভাঙ্গা নৌকা ছিল। সেখানা পড়ে থাকত—কাজে লাগত না। আমি সেখানা সারিয়ে

নিলুম। মইনুকে সঙ্গে নিয়ে সেই নৌকায় চড়ে মাছ ধ'রে প্রতিদিন গাঁয়ে বেচে আসতে আরম্ভ করলুম। এতেই এখন মইনুর ও আমার চলে।

দু বৎসর কেটে গেল মইনু আমাকে ছেড়ে থাকেনি আমিও মইনুকে ছেড়ে থাকিনি।

মইনুর শরীর অসুস্থ, সকালে উঠেই জানাল আজ সে আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। সেদিন আমি একাই গেলুম। ফিরে এসে দেখি মইনুর ভয়ানক জ্বর গা পুড়ে যাচ্ছে। দেখেই ভয়ে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। সে চমকে উঠে আমাকে বল্লে "ঐ যে বাবা এসেছে, দেখতে পাচ্ছ না। তুমি আমার কাছে এসে বস, আমার ভয় করছে, বাবা আমাকে নিয়ে যাবে"। আমি বল্লুম, "মইনু কি বলছ, এখানে তো আর কেউ নেই কেবল আমি আর তুমি, ঘুমোও"। আমার কথা শুনে একটু সচেতন হয়ে মইনু বল্লে "ওঃ তুমি আর আমি, কি ভুল বকছিলুম। এখানে বস আমি তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমোই। দেখ যেন ঘুম ভাঙ্গলে, চোখ মেলে তোমাকে আবার দেখতে পাই। আমার ভয় করে পাছে জেগে তোমাকে আর না দেখি"।

মইনুর মাথাটি কোলে নিয়ে সারারাত আমি জেগে বসে রইলুম। সারারাতের মধ্যে মইনুর আর জ্ঞান হল না। ভোরের দিকে দু একবার জল জল বলে চীৎকার

করেই মইনু চুপ করল—তার পরেই সব শেষ। কিছুক্ষণ আমার জ্ঞান ছিল না। পরে বার বছরের মেয়ের সেই ছোট্ট শরীরটিকে, সেই সাদা ধবধবে মইনু ফুলটিকে একলাই কাঁধে করে বয়ে নদী তীরে এনে শুকো কাঠ জড় করে জ্বালিয়ে দিলুম। চোখের সামনে যেমনি সব পুড়ে ছাই হল অমনি আমি দেখলুম আমার বুকের ভিতরটায় মস্ত বড় একটা ফাঁক—প্রকাণ্ড ফাঁক। বাতাস যেন সেখান দিয়ে হায় হায় করে বয়ে যাচ্ছে; আকাশ যেন নিজের শূন্যতা নিয়ে সেখানটায় হাঁ করে পড়ে রয়েছে।

তখুনি, সেই শ্মশান থেকেই সেই ভাঙ্গা নৌকায় চ'ড়ে আমি যাত্রা করলুম। কোথায় যাচ্ছি কোন ঠিকানা নেই, যাচ্ছি তো যাচ্ছি। কত গ্রাম কত সহর, কত নদ নদী পার হলুম। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন চলেইছি।

ক্রমে এই আকাশ বাতাস আমার বুকে গভীর সান্ত্বনা বয়ে আনতে লাগল। বুকে আমার নিত্যি যেন তারা হাত বুলিয়ে দেয়। সে কি নিবিড় আরাম কি সুগভীর শান্তি!

* * * *

তারপর দেখি আমার বুকের মাঝে কি ভীড়। হাজার হাজার মানুষ কি বিষম ঠেলাঠেলি করে আমার বুকের মধ্যে ঢুকছে। আমার বুকের ফাঁকটা ক্রমেই

যেন তারা ভরে তুলতে চাচ্ছে। যেখানে যত মানুষের মুখ দেখি সবাই আমার বুকের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ফাঁক পেয়ে এইখান দিয়ে আনাগোনা তাদের সহজ হয়েছে, বুঝেছ হে ফকির! তাই আমার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, রাতদিন তাই আমার বুকের দরজা খোলা রাখতে হয়। আস্‌তে চাইলে কাউকে তো আমি "না" বলতে পারিনে।

ফকির অবাক হয়ে দেবদূতের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্ধকারে দেখা যায় না তবু প্রাণপণে দেবদূতের মুখ দেখতে চেষ্টা করতে লাগলেন। দেবদূত বল্লেন "এইভাবে এক বৎসর ঘুরে শেষে বাবার রাজ্যে ফিরে আসি তারপর তোমরা তো জানই কি ভাবে আমার দিন কেটেছে"। একটু পরে ফকির বলে উঠলেন "দেবদূত আপনার বুকের সে ফাঁকটা কি জিনিষ যার ভিতর দিয়ে জগৎ সুদ্ধ লোক আনাগোনা করে?"

দেবদূত বল্লেন "তুমি ফাঁক চেন না—ফকির হয়েছ! ফাঁক না হলে কি কেউ ফকির হতে পারে হে!"

যত শোনেন ফকির ততই অবাক হন। আবার বল্লেন "ফুলটি তুমি ভাসাও কেন দেবদূত? কোথায় পাঠাও, কোনদিকে?

দেবদূত বল্লেন "স্বর্গের দিকে। স্বর্গ আমার জন্যে নয় তবু স্বর্গ খুব সুন্দর বলে আমি এই ভাবে তাকে

স্মরণ করে থাকি।" ফকির নিস্তব্ধ মুগ্ধ। দেবদূত বল্লেন "আমার কাজ শেষ হয়েছে। যা বাকি ছিল তোমাকে দিয়ে গেলুম। তুমি এই নিয়ে সংসারে ফিরে যাও আমি একটু বিশ্রাম করি।" এই বলে ফকিরের কোলে তিনি মাথা রাখলেন। পরক্ষণেই ফকির দেখলেন দেবদূতের প্রাণশূন্য দেহ তাঁর কোলে।

এই ঘটনায় ফকিরের বুকের ভিতরটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেল।

ওদিকে বাইরে আকাশ পরিস্কার হয়ে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে।

দশের দোসর

১

সমুদ্রতীরে এক মস্ত বড় সহর। প্রকাণ্ড জঙ্গল কেটে সহরটি পত্তন করা হয়। গোড়ায় কবে যে এর পত্তন হয়েছিল, কেউ তা বলতে পারে না। সে সময়কার কোন খবরই কেউ জানে না। তবে এক কালে এ সহরে যে ভালো ভালো লোকের জন্ম হয়েছিল, উঁচুদরের জ্ঞান এখান থেকে প্রকাশ পেয়েছিল, এর বুকের মধ্য থেকে গভীর আনন্দ জেগে উঠেছিল, সমস্ত প্রকৃতি নিজের একটি বড় রকমের সাম্রাজ্য এর বুকে স্থাপন করেছিলেন, ছয় ঋতু পালা করে এখানে আনন্দের সহজ গতিতে নৃত্য ক'রে ফিরত, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।

সেই পুরাণো বুড়ো চমৎকার সহরটির এখন যা দুর্দ্দশা, দেখলে বুক ফেটে চোখে জল আসে, ব্যথায় হৃদয় মুসড়ে পড়ে। সব গেছে। জ্ঞান লুকিয়ে পড়েছে পুঁথির মধ্যে, আনন্দের জায়গা জুড়ে বসেছে ভয় আর কান্না, প্রকৃতি বিকৃত হয়ে প্রতিনিয়ত বিপ্লব বাধিয়ে তুলছেন,

ঋতুগুলি ভাঙ্গাপালায় যখন তখন যেখানে সেখানে এলো-মেলো পা ফেলছে, গতিতে তাদের জীবন নেই আনন্দ নেই।

সব চেয়ে দুর্দ্দশা হয়েছে সহরের মানুষগুলোর। রোগে মরে, না খেয়ে মরে, ভাঙ্গা বাড়ী মাথায় চাপা প'ড়ে মরে, ঘর নেই যাব সে মাঠে দাঁড়িয়ে বর্ষায় ভিজে মরে, রৌদ্রে পুড়ে মরে; আর মরে পাড়া প্রতিবেশীর কিল চড় গুঁতোয়। গায়ে নেই জোর যে তাদের ঠেকায়, হাতে নেই অস্ত্র, যে তাদের ভাগায়।

কুঁড়ে গুলোর চালে নেই খড় দেয়ালে নেই মাটির লেপ; ঘরের ভিতরে খালি হাঁড়ি ঠনঠন করছে। পাকা বাড়ী আগাগোড়া ফাটলে ভরা, ফাটল ফুঁড়ে মাথা তুলছে মস্ত মস্ত গাছ, তাদের মোটা মোটা শিকড়গুলো মাটি পর্য্যন্ত লম্বা। আর দেয়ালের চারদিক জুড়ে ফাটলের মধ্যে বাসা করেছে চামচিকে, ছুঁচো, ইঁদুর, আরসোলা, আর মাকড়সা।

সহরের এই রূপটির সঙ্গে অবিকল খাপ খেয়েছে তার রোগে জীর্ণ না খেয়ে শীর্ণ অধিবাসীগুলি। তাদের মূর্ত্তি দেখলেই মনে হবে মরণ যেন তাদের বুকের উপর খেলা করে বেড়াচ্ছে।

এ হেন পতনোন্মুখ সহর তার মরণোন্মুখ মানুষগুলিকে নিয়ে সমুদ্রতীরে তবু কিন্তু বেঁচে আছে। নিঃশেষে তবু তার মরণ হচ্ছে না, কে জানে কেন?

২

সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে কত বড় বড় বাণিজ্য জাহাজ রাতদিন আসা যাওয়া করে। যাবার পথে কত দেশের কত লোক, সমুদ্রতীরের এই বুড়ো সহরটা দেখতে দেখতে যায়। দেখে কেউ মুখ ফেরায়, কেউ ঠাট্টার ভাবে হাসে, কেউ গলা ছেড়ে গাল দেয়, "সহরটার এমন ছিরি ছি ছি সহরের লোকগুলো কি মরেছে? একবার চোখ মেলে নিজেদের সহরটার দিকে কেউ চেয়ে দেখে না।'

যে যা বলে বলুক, যে যা ভাবে ভাবুক, সহরের লোকেরা এ সব কোন কিছু গায়েই মাখে না, এ সব কোন কথা কানেই তোলে না। অলস হয়ে একই রকমে তারা দিনের পর দিন কাটায়। ভাবে পূর্ব্বপুরুষ তপের জোরে সহরটাকে কায়েমি করে রেখে গেছেন কোনো কালে এর আর মার নেই। কারো সাধ্য নেই যে সেখান থেকে তাদের তাড়ায়। এমন কি স্বয়ং রাজাও তা পারেন না।

এইটুকু নিয়েই, এর অহঙ্কারেই তারা মত্ত। ওদিকে শকুনি গৃধিনী এসে মৃতদেহগুলোকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে, সহরে মড়া ফেলার লোক নেই সেদিকে কারো চোখ পড়ে না।

৩

ঝকঝকে পোষাক পরা একদল বণিক, সমুদ্রতীরের এই পুরানো সহরটি দেখবার জন্যে, একদিন যাওয়ার পথে জাহাজ থামিয়ে তীরে নামল।

সামনেই শ্রীনিবাস তার ভাঙ্গা অট্টালিকার বারন্দায় বসে। বণিকেরা জিজ্ঞাসা করলে "তুমি কে হে, তোমার নাম কি, এ বাড়ীখানা কি তোমার?"

শ্রীনিবাস বল্লে, "আমার নাম শ্রীনিবাস ঠাকুর। অনেক পুরুষ থেকে এ সহরে আমার বাস। প্রায় দু-হাজার বছর হল আমার পূর্ব্বপুরুষ এ ভিটাখানা তৈরী করে গেছেন। মশায়, এ আজকের জিনিষ নয়। অতি প্রাচীন, মশায়! অতি প্রাচীন।"

শুনে বণিকেরা হো হো করে হেসে উঠে বল্লে "প্রাচীন তো বুঝলুম হে, কিন্তু প্রাচীনের উপর কি নূতন করে সংস্কার হতে নেই? শুধু কেবল প্রাচীন হয়ে থেকেই চরম সুখ, হাঃ হাঃ হাঃ বল কি হে? ওদিকে প্রাচীন অট্টালিকা যে মাথায় ভেঙ্গে পড়ে, তার কিছু ঠিক আছে? সংস্কার চাই হে, সংস্কার চাই। দেশের রাজা হুকুম করে-ছেন তাঁর রাজ্যের সব জায়গা এখন নূতন হবে, পুরণো ভাঙ্গা ফাটা একচুল কোথাও থাকতে পারবে না। তোমরা যদি তোমাদের ঘর বাড়ী সহর নূতন করে তৈরী না কর

তবে আমরা তোমাদের সহর কেড়ে নিয়ে নূতন করে গড়ে তুলব। মাল মসলা সব আমরাই দেব, সহরটা তাহলে আমাদেরই হয়ে যাবে।"

শ্রীনিবাস বল্লে "আমাদের পূর্ব্বপুরুষ স্বয়ং রাজার হাত থেকে এ সহর কিনে ছিলেন, এবং এমনতর মাল মসলা দিয়ে সহরটা গড়েছিলেন যে, তোমাদের মাল মসলা তার সঙ্গে মিশ খাবে না, একটাও বাড়ী জোড় খাবে না হে, তোমাদের মসলায় একটাও বাড়ী জোড় খাবে না"।

বণিকেরা বল্‌ল, "জোড় না খায়, প্রাচীন সব ভেঙ্গে ফেলে আগাগোড়া আমরা নূতন করে গড়ব।"

শ্রীনিবাস বল্লে, "পারবে না হে, পারবে না। একেবারে এ সহর ভেঙ্গে ফেল্‌তে পারবে না। এ সহর আগুন দিয়ে গাঁথা, জল দিয়ে বাঁধা, বাতাস দিয়ে ছাপা, আকাশ দিয়ে মাপা। এ ভাঙ্গবার নয়! ফাটবে চটবে, কিন্তু একেবারে ভাঙ্গবে না হে, একেবারে ভাঙ্গবে না। হাজার তোমরা জোর দেখাও, তাড়াতে আমাদের পারছ না।"

বণিকেরা বল্‌ল, "ভাঙ্গা ফাটা কিছু তো আর দেশে রাজা রাখবেন না, হুকুম করেছেন পৃথিবী তার নূতন হবে। সংস্কার না কর, রাজা নিজেই সহর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেবেন, তখন কি করবে?"

শ্রীনিবাস বল্‌ল, "বছর বছর রাজার খাজনা আমরা গুণে দিচ্ছি, রাজা আমাদের তাড়াবেন কোন্ আইনের জোরে ?"

পথের ধারে কোথায় রাজপেয়াদা বসে ছিল। কথাটি শ্রীনিবাসের মুখ থেকে বের হওয়া মাত্র সে রুখে তার সামনে এসে বল্লে, "কি বলছ ঠাকুর, বছর বছর রাজার খাজনা তোমরা গুণে দিচ্ছ ? দেখ তো, তোমার দলিল খানা বের ক'রে কত বছর খাজনা দাও নি।"

খাজনা যে অনেক কাল দেওয়াই হয় নি, একথা শ্রীনিবাসের মনেই ছিল না। সে জোর দেখিয়ে দলিল আনতে ঘরে গিয়ে ঢুকল, রাস্তায় পেয়াদা আর বণিকেরা দাঁড়িয়ে রইল।

দলিলের বাক্স মাকড়সার জালে ঢাকা, কতকাল সে বাক্স খোলাই হয়নি। ভয়ে শ্রীনিবাসের বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল, দেখা গেল তিনশো বছরের খাজনা বাকি। ভিটাখানা কবে বাকি খাজনার দরুন রাজসরকার ভুক্ত হয়ে গেছে, তার ঠিকানাই নেই।

শ্রীনিবাসের বড় দরদ ঐ ভিটাখানার উপর। ভিটায় তার দখল নেই জেনে চোখ দিয়ে তার দরদর ধারায় জল পড়তে লাগল। বল্লে, "পেয়াদা, তবেত রাজা এখন সহরটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন, আর তো আমাদের জোর নেই, দাবী নেই, আমরা তো

বহু বছর খাজনা দিই নি, সহর তো আমদের অনেক কাল সরকারভুক্ত হয়ে গেছে। এখন আমরা দাঁড়াই কোথা"? রাজপেয়াদা বল্লে, "সহর এখন রাজার, দাও ছেড়ে তাঁর হাতে সহরের ভার। রাজা আসছেন, তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এ সহর তিনি নিজেই গড়ে তুলবেন। তাঁর আসার খবর দিতে ও তোমাদের দিয়ে কাজ সুরু করিয়ে দিতেই আমাকে আগে পাঠিয়েছেন। এই নাও মাল মসলা, সুরু করে দাও কাজ, ঠাকুর এখুনি সব বদলাতে সুরু করে দাও। ভিটে সহর সব নতুন করে তুলতে হবে, আগা-গোড়া নতুন। প্রাচীনকে যে নিত্যি নতুন করে তোলা চাই, তাকি জান না? স্বয়ং ভগবানই যে নিত্য নূতন হয়ে দেখা দেন, রূপটা তো বদলান চাই ঠাকুর।

শ্রীনিবাস অবাক্ হয়ে রাজপেয়াদার মুখের দিকে চেয়ে রইল ও ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার হাতের রাজদত্ত মাল মসলা-গুলির দিকে বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

পেয়াদা বল্লে "অন্য সব সহর, রাজ্য, রাজা আর পাঁচ জনকে ভাগ করে দিয়েছেন কেবল এই সহরটি রেখেচেন নিজের জন্য, এখানে রাজার নামেই সব কাজ হবে, অন্য কারো নামে এখানকার কোন কাজ হতে পারবে না।"

রাজপেয়াদার কথা শুনে শ্রীনিবাস দৌড়ে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে বলে উঠল, "নিন রাজা নিন,

সব নিন্, আসুন তিনি এ রাজ্যে, তাঁর রাজ্য তিনি করুন, আমরা তাঁর চিরদাস হয়ে কেবল তাঁর কাজে জীবন ধারণ করে থাকি।”

এই বলে শ্রীনিবাস দুই হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে রাজার নামে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

এদিকে রাজ্যময় সাড়া পড়ে গেল রাজা আসছেন, রাজা আসছেন। পথে ঘাটে লোক ধরে না, সবাই কাজে ব্যস্ত, ভাঙ্গা-চোরা মেরামত, অপরিষ্কার জায়গা পরিষ্কার করা, চামচিকা বাদুড় ব্যাঙ তাড়ান, মাটির দেয়াল নিকানো, পাকা দেয়ালের ফাটাল বোজান, পুরণো বাসন-পত্র মাজা-ঘসার ধূম পড়ে গেল সহরময়। রাজা আসছেন।

সকলেই কাজে মহা ব্যস্ত, এমন সময় সাদা ঘোড়ায় চড়ে রাজা এসে উপস্থিত। রাজার মুখের সোণার আলোয় দিক্ ভরে উঠল, বাতাস সুগন্ধে ভরে গেল, চারিদিকে আনন্দ কোলাহল উঠল।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। পরণে তাঁর সাধারণ বেশ। রাজাকে দেখার জন্যে পথে লোকের কি ভীড়, রাস্তায় চলা ভার। ভীড় ঠেলে একটি ছোট মেয়ে এগিয়ে রাজার হাত ধরে রাজাকে বল্লে, “তুমিই কি রাজা, তুমিত আমাদেরই মত মানুষ, তবে তোমাকে লোকে মানুষ না বলে রাজা বলে কেন?” রাজা বল্লেন, “সেটা লোকের ভুল, আমি রাজা নই, আমি সত্যিকার মানুষ।”

মেয়েটি বল্‌ল, "বাঃ! তবে তুমি আমাদের সঙ্গে না থেকে আলাদা থাক কেন?" রাজা বল্লেন, "লোকে আমাকে রাজা খেতাব দিয়ে ঠেলে আলাদা করে রেখেছে, কাছে আসতে দেয় না,—সেই তো আমার দুঃখু!"

মেয়েটি বল্‌ল, "তাই বুঝি তুমি আমাদের কাছে এসেছ আমাদের মধ্যে থাকবে বলে; তাই বুঝি ঘোড়া থেকে নামলে আমাদের সঙ্গে হাঁটবে বলে? বাঃ! কি মজা! রাজা আর আমরা এক হয়েছি, কি মজা!"

রাজা বল্লেন "আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলতে, আর রাতদিন একলা থেকে কেবল বিশ্রাম করতে। তোমাদের মাঝে এসে পড়ে আজ আমি বাঁচলুম, রাজা হওয়ার দুঃখু থেকে নিষ্কৃতি পেলুম, এখন আমি তোমাদের দশেরই একজন।

মেয়েটি বল্ল, তুমি যদি রাজা নও, এ সহর তবে কার?"

রাজা বল্লেন, "দশের"।

পথের মানুষ

১

খালি পা, গায়ে ছেঁড়া চাদর জড়ান, কতকটা সাধু সন্ন্যাসীর কতকটা ভিখারীর সাজ, একটি মানুষকে কিছুদিন থেকে নগরের দুয়ারে দুয়ারে ফিরতে দেখা যায়। সে কারো কাছে কিছু চায় না, কেবল দুয়ারে গিয়ে দাঁড়ায়। যদি কেউ বসতে বলে ত বসে, খেতে দিলে খায়, কেউ কিছু না বলে ত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে চলে যায়। কাউকে ত্যক্ত করে না, কাউকে ব্যস্ত করে না, শুধু সে যায় আর আসে।

এই ভাবে তার পথে পথে কত বছর কেটেছে, তা কেউ জানে না। সে নিজেও জানেনা, রাস্তায় তার কত বছর কাটল। সে সাল মাস গোণে না, আজ কাল ভাবে না। যখন আছে, কেবল সেইক্ষণটুকুতেই যেন জানে, যেখানে আছে কেবল সেই জায়গাটুকুকেই যেন চেনে, এই রকমের তার ভাবখানা।

লোকটা নিজের মনেই উদাসী কি কোন দলভুক্ত

সন্ন্যাসী, পেটের অন্নের জন্যে নিজের পরেই ভরসা, কি ভিক্ষা করা ব্যবসা, বোঝা দায়। আসল কথা লোকটাকে ধরা যায় না। কোনোদিন দেখা যায় রাস্তায় পড়ে ঘুমোচ্ছে, কোনদিন নদীর ধারে শুয়ে আছে, কোনদিন খোলামাঠে হাত পা ছড়িয়ে সটান লম্বা হয়ে পড়ে আছে।

আর যাই হোক, লোকটা কিন্তু পাগল নয়। কথা যা কয়, তাতে পাগলামীর কোনই চিহ্ন নেই, যদিও কথা খুব কমই কয়, আর গলার আওয়াজটাও কিছু মৃদু।

ছেঁড়া চাদরখানা মুড়ি দিয়ে ভোর রাত্রে একদিন সে গঙ্গার তীরে পড়ে আছে। মেয়েরা তুচার জন চলেছে গঙ্গাস্নানে। তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে হঠাৎ একজন স্ত্রী-লোকের পা লোকটার গায়ে গেল ঠেকে, স্ত্রীলোকটি ব'লে উঠল "কে শুয়ে গো, ছি ছি পা ঠেকে গেল গায়ে, তুমি কে বাবা" ?

লোকটা বল্লে "আমি মানুষ"।

স্ত্রী। এখানে কেন শুয়ে, তোমার কি ঘর নেই ?

লো। এই তো আমার ঘর, এই পৃথিবী আর এই মাটি। মাটি দিয়েই তো লোকে ঘর গড়ে ?

স্ত্রী। এমন খোলা জায়গায় পড়ে আছ, বাছা !

লো। কেন এই তো এত বড় আকাশ আমাকে ঢেকে রয়েছে।

স্ত্রী। জল ঝড় রোদ্দুর গায়ে লাগে না, তাদের কাছ থেকে বাঁচ কেমন করে ?

লো। তুমি কেমন করে কাপড় পরে থাক ?

স্ত্রী। সে যে আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

লো। এদেরও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, এরা আমার পোষাক।

কথা শুনে স্ত্রীলোকটির মনে বড় কৌতূহল জন্মাল কথা আরো শুনতে। জিজ্ঞাসা করলে "তুমি খাও কোথা" ?

লো। সেথা পাই।

স্ত্রী। কর কি ?

লো। কিছুই না।

স্ত্রী। তোমার কোনই কাজ নেই ?

লো। আছে, ঘুরে বেড়ান।

স্ত্রী। তাতে হয় কি ?

লো। খুসী হই।

স্ত্রী। খুসী হয়েই বেঁচে আছ ?

লো। হাঁ।

স্ত্রী। তোমার কে আছ ?

লো। জানি না, আমি কথনো কাউকে জিজ্ঞাসা করিনি, তারা কেউ আমার কি না ! তাই আমি জানি না, আমার কে আছে।

স্ত্রী। তোমার বাপ মা নেই?

লো। মনে পড়ে না।

স্ত্রী। তোমার নাম কি?

লো। জানি না, বাপ মাকে তো মনে নেই, নাম বলবে কে?

স্ত্রী। এই ভাবে তুমি বেশ সুখে আছ?

লো। সুখ ছাড়া আর কিছুই আমার নেই।

স্ত্রী। তুমি এক নূতনতর মানুষ দেখছি।

লো। সৃষ্টিকর্ত্তা আমাকে এমনি করেই সৃষ্টি করেছেন।

স্ত্রী। তুমি বাপ মাকে জান না সৃষ্টিকর্ত্তাকে জানলে কেমন করে?

লো। হয় বাপ মা আছেন, নয় সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, একটা তো বলতে হবে? বাপ মা বল্লে লোকে দেখতে চায়, নাম জিজ্ঞাসা করে, সৃষ্টিকর্ত্তা বল্লে কোন গোল নেই, কেউ দেখতেও চায় না, নামও জিজ্ঞাসা করে না, এক কথায় মিটে যায়।

স্ত্রীলোকটির কৌতূহল বাড়তে লাগল। সে বল্লে "তোমাকে আমার বাড়ী যেতে হবে। কোন কষ্ট হবে না, আমি তোমাকে যত্নে রাখব; চল আমার বাড়ী।"

লো। আমাকে নিয়ে গিয়ে কি করবে, আমার দ্বারা তো কোন কাজ হবে না।

স্ত্রী। কাজ চাই না, শুধু কথা শুনবো।

লোকটি বল্‌ল, "চল"।

দুজনে পথ ধরে বাড়ীর মুখে চলল। সে দিন আর স্ত্রীলোকটির গঙ্গা স্নান হল না।

২

সকাল হয়েছে। রাস্তায় লোক চলা-ফেরা করছে। স্ত্রীলোকটি আগে আগে, ছেঁড়া চাদর পরা মানুষটি তার পিছে পিছে চলছে। কিছু ক্ষণ পরে একটা মস্ত বড় বাড়ীর সামনে এসে স্ত্রীলোকটা থেমে দাঁড়ল। বল্লে "এই আমার বাড়ী, এস বাবা ভিতরে।" বাড়ীখানার দিকে চেয়ে দেখে লোকটা বল্লে, এ জায়গাটা যে চারিদিক থেকে চাপা, আসবাব-পত্র দিয়ে, লোক-লস্কর দিয়ে, সোনা-দানা দিয়ে, আশা দিয়ে, নেশা দিয়ে একেবারে ঠেসে চাপা! এর ভিতর ঢুকতে গেলে আমি হাঁপিয়ে মারা যাব।

স্ত্রীলোকটি একটু লজ্জিত হয়ে বল্লে, "কাছেই আমার একটা বাগান পড়ে আছে, তাতে ঘর বাড়ী কিছুই নেই, তুমি অনায়াসে তাতে থাকতে পারবে। চল, সেখানে তোমাকে নিয়ে যাই।" এই বলে, বাড়ী না ঢুকেই লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে, সে আবার চলতে আরম্ভ করল।

একটুখানি গিয়েই বাগান। কতকগুলো সার বাঁধা সুপুরি ও নারকেল গাছ, ঘেঁসাঘেসি বসানো কতকগুলো আম গাছের জঙ্গল, দুটো চারটে বেল, তাল, পেয়ারা গাছ এদিক ওদিক ছড়িয়ে, কিনারায় কতকগুলো বাঁশ ঝাড আর মাঝখানে দুটো পুকুর। পুকুর দুটো একটা ডোবা বল্লেই হয়, পানায় ঢাকা এঁদো পড়া, একটার জল ভালো, তাতে একটা বাঁধানো ঘাটও আছে। পাড়া-প্রতিবেশী আট দশ ঘর হাড়ি মুচি ও চাঁড়াল। ক্রোশ খানেকের মধ্যে ভদ্রলোকের বাস নেই বল্লেই হয়। ক্বচিৎ যদি দু'একঘর দেখা যায়।

বাগানটা বহুকালের পোড়ো, কেউ কখনো তাতে বাস করেনি। হাড়ি মুচিদের মেয়েরা, দিনের বেলা, দু-চার কলসী জল নিতে বাগানের মধ্যে যাওয়া-আসা করে—পুকুরটার জল ভাল ব'লে, সন্ধ্যার পর সেদিকে জনমানবের চলাচল নেই। লোকটা বাগানের মধ্যে ঢুকেই বল্লে, "হাঁ, এখানে আমি থাকতে পারব"। তাকে সেইখানে রেখে স্ত্রীলোকটি বাড়ী ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ফল, মিষ্টান্ন বোঝাই একটা চাঙ্গারী মাথায় একজন মুটে এসে বাগানে ঢুক্‌ল। চাঙ্গারীর উপর গায়ে দেবার নূতন একখানা চাদর। মানুষটার সামনে চাঙ্গারী নামিয়ে মুটে বল্লে "মা ঠাকরুণ আপনার জন্যে পাঠিয়েছেন"। ব'লে, চাঙ্গারীটা রেখে মুটে চলে গেল।

বেলা যখন দুপুর পাড়ার ছোট জাতের মেয়েরা এসেছে পুকুরে জল নিতে। লোকটা তাদের ডেকে বল্লে, "তোরা এসব নিয়ে যা, ভাগ করে নিস্, দেখিস্ যেন সবাই পায়। গায়ে যার মোটেই কাপড় নেই চাদরখানা তাকেই দিস্।" এই বলে চাদর সুদ্ধ চাঙ্গারীখানা লোকটা তাদের একজনের মাথায় তুলে দিলে। মেয়েরা তাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে চাঙ্গারী মাথায় নিয়ে চলে গেল।

বৈকালে স্ত্রীলোকটি এসে দেখ্‌ল, লোকটা চুপচাপ পড়ে রয়েছে ; ছেঁড়া চাদর গায়ে যেমন ছিল, ঠিক তেমনি আছে, ফল মিষ্টির একটুকরোও কোনখানে পড়ে নাই। কি হয়েছে, কিছু বুঝতে না পেরে, দুচারটি কথা কয়েই সেদিনকার মত সে চলে গেল।

পরদিন আবার এক চাঙ্গারী খাবার এল মুটের মাথায়। দুপুরে মেয়েরা এসে আবার সে গুলি সব নিয়ে গেল। ক্রমে এটা দৈনিক হয়ে দাঁড়াল।

রোজ এই রকম খাবার পেতে পেতে লোকটির কাছে মেয়েদের ভয় সঙ্কোচ কমে আসতে লাগল। এখন তারা দাঁড়িয়ে দুচারটে কথা তার সঙ্গে কয়।

একদিন একজন বল্লে,"জাননা এটা যে ভূতের বাগান। তুমি রাতে একলা এখানে থাক কেমন করে ? ভয় করে না ?"

লো। না ?

মেঃ। ভূতকে বুঝি তুমি ভয় কর না ?

লো। মোটেই না।

মে। যদি ভূত এসে পড়ে, তখন কি করবে ?

লো। মেরে তাড়াব।

মে। ওমা ! তুমি ভূতকে মারতে পার ? তুমি বুঝি ভূতের রোজা !

লো। না, আমি রোজা নই, কিন্তু জোর করে ভূত তেড়ে এলে, মেরে তাড়াব। একবার ভয় পেলে, ভূত আর কখনো আসবে না।

মে। ভূত কি কাউকে ভয় করে ? ভূতকেই তো সবাই ভয় পায়।

লো। সেইজন্যেই তো ভূতও সবাইকে চেপে ধরে। একবার তাকে ভয় দেখাতে পারলে, আর কেউ তাকে ভয় করবে না।

মে। ওমা ভূতকে বুঝি আবার কেউ ভয় দেখাতে পারে ? তুমি বুঝি ভূতকে ভয় দেখাতে পার ?

লো। তোমরাও পার।

মে। ও বাবা আমরা ভূতকে বড্ড ভয় করি।

লো। আর ভয় করতে হবে না, এইবার ভূত তোমা-দের দেখলেই পালাবে।

মে ! কেমন করে গা ?

লো। দেখতেই পাবে।

তারা অবাক্ হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া চা-ই করতে লাগল ও নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করতে করতে চলে গেল।

৩

এদিকে স্ত্রীলোকটি ভাবে রোজ আমি এত খাবার পাঠাই সে সব খায় কে? দেখতে হবে ব্যাপারটা কি? একদিন দুপুরে চুপিচুপি এসে বাগানের ধারে সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল, লোকটা স্নান করে, বাগানের গাছ থেকে একটা পাকা বেল পেড়ে, খেয়ে খানিকটা জল খেলে। কিছুক্ষণ পরে একটা মুচির মেয়ে এল জল নিতে। জল নিয়ে সে লোকটার কাছে এসে বল্লে, "আমার ছোট্ট ভাইটি খিঁচ্‌চে, তাকে ভূতে পেয়েছে। মা বল্লে, তোমাকে ডেকে নিয়ে যেতে; তোমার পায়ে পড়ি বাবা, আমার ভাইটাকে তুমি ভূতের গরাস থেকে বাঁচিয়া দাও।"

লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে বল্লে, "আচ্ছা চল।" খাবারের চাঙ্গারীটা মেয়ের মাথায় তুলে দিয়ে লোকটি তার পিছু পিছু চলতে লাগল, মেয়েটি আগে আগে।

কিছু দূরে গা-ঢাকা হয়ে, তাদের পিছনে পিছনে স্ত্রী-লোকটিও চলছে।

একটি দুবছরের ছেলে মাটির ঘরের দাওয়ায় পড়ে হাত পা খিঁচচে, দেখা গেল। কাছেই একরাশ তুলসী-গাছের একটা ঝোপ। কতকগুলো তার পাতা তুলে ছেঁচে রস করে তাড়াতাড়ি গরম করে খাওয়ান মাত্র ছেলেটির খেঁচুনি বন্ধ হয়ে গেল, ছেলেটি সুস্থ হয়ে উঠল।

ছেলের মা লোকটার পায়ের উপর প'ড়ে, "ভূত তাড়িয়ে তুমিই আমার ছেলেকে বাঁচলে, বাবা! তুমিই বাঁচালে!" ব'লে বারম্বার আকুলি বিকুলি করে, তার কাছে নিজের কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল।

লোকটি বল্লে, "বাড়ী ঘর বিছানা পত্র খাবার জিনিস শরীর কোন কিছু যদি অপরিষ্কার রাখিস্, আর পচা মাছ, পচা মাংস খাস্, তাহলে আবার ভূত এসে চাপবে, আর আমি বাঁচতে পারব না। দেখিস্, সাবধান, এখন থেকে খুব পরিষ্কার থাকবি চারিদিক খুব পরিষ্কার রাখবি।"

তারা সকলে একসঙ্গে বলে উঠল, "পরিষ্কার হলেই ভূত পালাবে?"

লোকটি বল্ল, "হাঁ পরিষ্কার হলেই ভূত একবারে পালাবে, আর কখনো আসবে না।"

সেই থেকে তারা, ঘর, বাড়ী খাবার জিনিষ শরীর সব পরিষ্কার রাখতে আরম্ভ করল। তার পর থেকে সে রকম রোগও আর কখনো তাদের মধ্যে দেখা দেয়নি!

স্ত্রীলোকটি গোপনে দাঁড়িয়ে সব দেখল এবং সেদিন

আর তার সঙ্গে দেখা না ক'রে, সেইখান থেকেই বাড়ী ফিরে গেল। তার মনের মধ্যে নানা রকম তোলপাড় হতে লাগল।

পরদিন দুপুরে আবার সে লুকিয়ে এসেছে। দেখে, যার ছেলে রোগমুক্ত হয়েছে, সেই মুচিনী, একটু কি খাবার নিয়ে এসে লোকটার সামনে ধরে বল্লে "বাবা একটু খাও।" তৎক্ষণাৎ লোকটি তার খাবার নিয়ে খেয়ে ফেললে। খাবারটা আর কিছু নয় কাঁচা চিঁড়ে গুড়ের সঙ্গে জ্বাল দিয়ে লাড়ু তৈরী করা।

পরদিন সকালে স্ত্রীলোকটি, মুটের মাথায় এক ঝাঁকা খাবার দিয়ে, তাকে সঙ্গে করে এনে, বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, অল্প কিছু খাবার হাতে লোকটার সামনে গিয়ে বল্লে "বাবা, আমার দেওয়া এইটুকু খাবার আজ তোমাকে খেতেই হবে। তুমি এক দিনও আমার খাবার খাও না, আমি নিজের চোখে দেখেছি। কাল মুচির মেয়ে খাবার টুকু দিলে, তুমি কত খুসী হয়ে খেয়েছ, তাও আমি দেখলুম। আমার খাবার কেন খাবে না, এ খাবার কি ভাল নয় ?

"খুব ভাল, তাই জন্যেইতো সকল লোক তোমার খাবার খেতে ইচ্ছা করে। সকলের খাওয়াটা যে ঢের বড় কথা! তোমার খাবারে তাই রোজ খুব বড় কাজ হয়। মুচির মেয়ের খাবার তো কেউ খেতে ভাল

বাসবে না, কিন্তু সেটাও তো কোন একজনের খাওয়া চাই তাই আমিই সেটা খেয়েছি।”

এই মানুষটির কথা সে যখনই শোনে, তখনই তার তার মনের মধ্যে কেমন একরকম নাড়া দেয়। আজকের কথাতেও তার মনটা খুব নাড়া দিয়ে উঠল। সে বল্লে আমার মনে বাবা! একটুও সুখ নেই, আমি কি করে সুখ পাব, তা বল, আমার আর সব আছে, কেবল সুখ নেই। তোমার আর কিছুই নেই, কেবল সুখ আছে। তোমাতে আমাতে কি তফাৎ! আমি কেমন করে সুখ পাব, আমাকে বলে দাও।

মা। সুখ তো কোন জিনিষ নয়, যে সেই জিনিষটা পেলেই সুখকে পাবে। সুখ মনের একটা সহজ অবস্থা। কিছুকাল ধরে মনটাকে সহজ ভাবের মধ্যে ফেলে রাখতে পারলে, সুখ তার ভিতর থেকে আপনিই জেগে ওঠে।

স্ত্রী। কেমন করে সহজ হব, কেমন করে সহজ ভাবের মধ্যে মনটা রাখব, আমাকে বলে দাও।

মা। এই এদের মধ্যে থাক, এই সব হাঁড়ি, মুচি চণ্ডালের মধ্যে, এদের খাওয়াও, বাঁচাও, টেনে তোল, সুখ আপনি আসবে।”

স্ত্রী। বাবা আমার ইচ্ছা করে নিজের বাড়ী নিয়ে ওদের আমি খুব করে খাওয়াই, কিন্তু ওরা তো আমার

বাড়ী যাবে না। ওরা আমাকে ঘৃণা করে। আমি পতিতা।

মা। পথে বেরিয়ে পড়তে পারলে পতিতা অপতিতা সব এক হয়ে যাবে, কেউ আলাদা থাকবে না। পথে কি আর কেউ কারো পরিচয় নেয়? বেরিয়ে পড়, পথে বেরিয়ে পড়, আকাশে কর ঘর বাতাসে কর ভর দুনিয়াকে কর দেশ, সহজে হবে শেষ।

কথা শুনে স্ত্রীলোকটি অবাক্ হয়ে লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার মাথার চারিদিকটা যেন খোলা বোধ হতে লাগল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “আমার নাম ধাম যে বদলাতে হবে বাবা আমাকে যে সবাই চেনে।

মা। নামে কি দরকার? নাম নিয়েই তো যত ল্যাটা। নাম ছেড়ে দাও অনেক গোল মিটে যাবে। আর ধাম? কেউ জিজ্ঞাসা করলে, দেখিয়ে দিও, ঐ হাড়িনী আর চামারনিদের ঘর।

স্ত্রী। দেখিয়ে দাও, বাবা! আমাকে পথ দেখিয়ে দাও। কেমন করে এ পথে চল্‌ব ভালো করে বুঝিয়ে দাও।

মা। এ পথ কাউকে দেখিয়ে দিতে হয় না, নিজেই জানা যায়; যার পথ সে নিজেই চিনে চলতে পারে ঘরে যাও, ঘরে বসেই পথ দেখতে পাবে।

স্ত্রীলোকটি নিজের অন্তরের মধ্য থেকে কেমন যেন একটা সাড়া পেতে লাগল; খানিক স্তব্ধ হয়ে ব'সে সে উঠে আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চল্‌ল।

স্ত্রীলোকটি পথ দিয়ে যায়, আজ আর পথের কোন কিছু তার চোখে পড়ে না। সব যেন ধোঁয়া, সব যেন ছায়া। আজ সে কি অন্যমনস্ক; মাথার ভিতর তার কেবলই ঘুরছে, "বেরিয়ে পড়, পথে বেরিয়ে পড়।" সে জানে না, কোথায় বেরবে, কোন পথে যাবে; জানে না, সে পথের আরম্ভ কোথায়।

মানুষটি তাকে বলেছে ঘরে বসে পথ দেখতে পাবে। আজ তো তার ঘর বলে কিছু নেই। ঘরে তার কে আছে? যারা আছে তারা তো তার কেউ নয়! তারা তো পথের মানুষ নয়! তবে সেখানে সে কার কাছে যাবে? কতকটা স্পষ্ট কতকটা অস্পষ্ট ভাবে এই রকম নানা কথা এলো মেলো হয়ে তার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগল।

কতক্ষণ সে নিজের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জানে না। সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ। বাড়ীটার দিকে চাওয়া মাত্র মনে হল পৃথিবী যেন তার পায়ে নীচে থেকে সরে যাচ্ছে, পায়ের নীচে যেন মস্ত একটা গহ্বর তার মধ্যে সে যেন আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে, চোখের সামনে বাড়ী-খানা দুলছে এখুনি ভেঙ্গে তার মাথার উপর পড়ে তাকে

সেইখানে কবরস্থ করবে। তার মাথাটা ঘুরে গিয়ে সেই-খানে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

যখন চোক মেল্‌ল, দেখে একটা মাঠের মধ্যে সে শুয়ে চারিদিক অন্ধকার, মাথার উপর খোলা আকাশ, তার বুকে এক রাশ তারা জ্বল্‌ছে; কিছু দূরে সেই লোকটা নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোকটাকে বাগানে এনে রাখার পর থেকে দিনের বেলায় তাকে পথে ঘুরে বেড়াতে কেউ কোন দিন দেখেনি, কিন্তু রাতের বেলায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে তাকে অনেকেই দেখেছে।

ইদানীং সবাই তাকে চিনেছিল, কেউ আর এতে কিছু ভাবতো না। জানতো, লোকটার এই রকমই স্বভাব।

দূরে মাঠের মধ্যে লোকটাকে দেখে স্ত্রীলোকটির বুকের ভেতর আজ বড্ড নাড়া দিয়ে উঠল। সেই যেন তাকে টেনে নিয়ে কোথায় চলেছে। আপনাতে সে আপনি যেন নেই।

উঠে সে দাঁড়াল, পা টলছে, কোন রকমে এগিয়ে লোকটার দিকে চল্ল। কাছে গিয়ে বলে উঠল, "বাবা, এ আমি কোথায় এসেছি?"

লো। এই যে এখানে, বাইরে।

স্ত্রী। এখানে কি আছে?

লো। সব আছে, যা চাও।

স্ত্রী। কই, আমি তো কিছু পাচ্ছি নে"।

লো। এই তো সবে মাত্র বেরিয়ে এসেছ! একটু স্থির হয়ে দাঁড়াও, তবে ত পাবে।

স্ত্রী। আমি তো দেখছি, এসব খালি।

লো। না, এর কিছুই খালি নয়, সব ভরা, আগা-গোড়া ভরা,—প্রাণ দিয়ে, চেতনা দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, রস দিয়ে, আনন্দ দিয়ে এর সমস্তটা ভরা,—একেবারে নিরেট করে ভরা, একবিন্দুও ফাঁক নেই"।

স্ত্রী। এটা নেবার শক্তি বোধ হয় আমার নেই, বাবা! আমি এর কিছুই তো নিতে পারছি নে!

লো। সময় লাগবে, সময় লাগবে। কিছুদিন এটার মধ্যে নিজেকে ফেলে রাখতে হবে। ঘরের মধ্যে থাকা অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল বাইরে তো কখনো এস নাই;—তাই এদের সঙ্গে পরিচয় নেই! ক্রমে সব সহজ হয়ে আসবে!

স্ত্রীলোকটি শান্ত হয়ে লোকটার পায়ের কাছে পড়ে রইল।

৬

সকাল হয়েছে, মাঠে জনপ্রাণী নেই, স্ত্রীলোকটি একলা। দাঁড়িয়ে সে কিছুক্ষণ ভাবল কোনদিকে যায়। শেষে মুচিপাড়ার দিকেই চলল।

হাড়ি চামার চাঁড়ালের বউঝিরা তখন সবে মাত্র ঘরের কাজ সুরু করেছে। চুপটি করে একপাশে একজন মেয়ে মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাদের মধ্যে এক-জন জিজ্ঞাসা করল "তুমি কে গা?"

স্ত্রী। আমি স্ত্রীলোক!

মে। কোথা থেকে আসছ?

স্ত্রী। মাঠ থেকে।

মে। কি চাও?

স্ত্রী। এখানে থাকব।

মে। তুমি কি জাত?

স্ত্রী। আমার জাত নেই।

মে! এখানে থেকে কি করবে?

স্ত্রী। তোমাদের কাজ করব।

মে। কি কাজ?

স্ত্রী। যা তোমরা বলবে।

মে। আমাদের কাজ করে তোমার কি হবে?

স্ত্রী। সুখ হবে।

মে। তুমি বুঝি সুখ চাও?

স্ত্রী। হাঁ, আমার সব ছিল কেবল সুখ ছিল না; তাই তোমাদের কাছে সুখ নিতে এসেছি।

মে। আমাদের কাছে বুঝি সুখ আছে?

স্ত্রী। হাঁ।

মে। কই, আমরা তো জানিনি!

স্ত্রী। তোমরা জাননা, কিন্তু আমি জানি।

মে। জান তো নাও, থাক তবে ঐখানে।

এই বলে, কাছেই এক চামারের বাড়ী পড়ে ছিল, কয়েক দিন হল তারা অন্য গাঁয়ে উঠে গেছে, সেই বাড়ীটা সে দেখিয়ে দিল।

বাড়ী দেখে স্ত্রীলোকটি খুব খুসী হয়ে বল্‌ল,—

বাড়ীটা পেয়ে বড় খুসী হলুম, তুমি সুখে থাক বাছা।

মে। তোমার নামটি কি?

স্ত্রী। আমাকে তোমরা "খুসী" বলেই ডেক।

মে। বাঃ! বেশ তো নামটি, আমাদের সঙ্গে বেশ মিশ খেয়ে যাবে।

স্ত্রী। তোমাদের সঙ্গে মিশ খেয়ে গেলে, আমিও খুসী হবো।

৭

সেই লোকটাকে তার পরে আর সে পাড়ায় কেউ দেখেনি। একদিন ভোরের সময় দেখা গেল, ছেঁড়া চাদর পরা লোকটার শরীর গঙ্গার জলে ভাসছে। চাদরখানা তখনো তেমনি ভাবেই গায়ে জড়ান। দাঁড়িয়ে যারা দেখছিল, শ্মশানের একজন মুর্দ্দাফরাস তাদের বল্‌ল, মশায় আমি

দেখেছি কাল রাতে লোকটা এসে, সটান লম্বা হয়ে জলের উপর শুয়ে পড়ল নড়ল না চড়ল না, একবার ডুবলও না, শুয়েই অমনি সহজভাবে ভাসতে লাগল। এখনো ঠিক তেমনি ভাবেই ভাসছে, অবিকল সেই রকম!

মুর্দ্দাফরাসের কথায় কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না।

এদিকে দেখতে দেখতে গঙ্গায় জোয়ার এসে শরীরটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেল।

দর্শকেরা ফিরল। পথে যেতে যেতে একজন বল্লে "স্নান করতে গিয়ে লোকটা গঙ্গায় ডুবে গিয়ে থাকবে।"

আর একজন বল্লে, "তা হতেই পারে।"

১ম। লোকটা কিন্তু অসাধারণ ছিল, হে!

২য়। তা আর বলতে।

কাপালিকের কপাল

১

শীতকাল, রাত্রি তিনটা। তখনও ভোরের আলোর আভাটুকুও দেখা দেয়নি। ঘোর অন্ধকারে চারদিক ঢাকা। পথে মানুষের চলাচল দূরে থাক্ শেয়াল কুকুরের সাড়াটি পর্য্যন্ত নেই। গভীর নিস্তব্ধতা ঘন হয়ে চারিদিককে যেন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও একটুকু শব্দ হলেই অমনি তাকে চেপে মারবে, নিজের অটল গাম্ভীর্য্যকে মুহূর্ত্তেরজন্য ও ভাঙ্গতে দেবে না, এমনিতর ভাব।

সেই নিস্তব্ধতার কোলে, সেই অন্ধকারের মধ্যে ঠিক তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে হরিদ্বারের পথে গঙ্গাতীরে এক সন্ন্যাসিনী বসে। কম্বলের তৈরী একটি আলখাল্লার উপর একখানা গেরুয়া রঙের সাড়ী পরা, হাতে দুগাছি লাল রুলি, মাথার একরাশ খোলা চুল পিঠ ছাপিয়ে মাটিতে পড়ে লুটচ্ছে, সন্ন্যাসিনী গঙ্গার জলে পা দুখানি ডুবিয়ে তীরে বসে আছে।

নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে সন্ন্যাসিনী হঠাৎ গেয়ে উঠ্‌ল 'পার

কর হে পার কর হে পার কর, এই পারের এই দুখের কথা আর কইতে নারি যে, পার কর।

গানের সুর অন্ধকারের বুকের উপর ছড়িয়ে পড়ে তাকে যেন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরতে লাগল। নিস্তব্ধতা তখনও অটল মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে, সুরের স্পর্শ তার বুকের ভিতর কেবল একটু একটু কাঁপন তুলেছে। অন্ধকার ছাপিয়ে, নিস্তব্ধতা কাঁপিয়ে ক্রমেই সুর পর্দ্দায় পর্দ্দায় ওঠা নামা করতে লাগল, সন্ন্যাসিনী গাইছে 'ভার হর হে ভার হর হে ভার হর, এই পারের এই ভারের ভার আর বইতে নারি যে ভার হর'।

সন্ন্যাসিনীর গলা চমৎকার। শেখা গলা ছাড়া সুরের এমন খেলা, এমন মূর্চ্ছনা, এমন গতি ভঙ্গী, তাল মান লয়ের এমন সুন্দর সামঞ্জস্য হতেই পারে না। সন্ন্যাসিনী সুগায়িকা। গলার মিষ্টি আওয়াজে সুরের এই আশ্চর্য্য খেলা অন্ধকারের বুকটাকে যেন ভিজিয়ে তুলতে লাগল, অন্ধকার নিজের বুক পেতে তার বুকের ভার নামিয়ে নেবার জন্যে যেন কাছে এসে দাঁড়াল। একটু থেমে, বুক ভাঙ্গা একটা নিশ্বাস ফেলে সন্ন্যাসিনী আবার গাইতে লাগল 'পাপ তার হে, পাপ তার হে, পাপ তার, এই পারের এই পাপের তাপ আর সইতে নারি যে পাপ তার।'

গানের এই কলিটি শেষ হতে না হতে পিছন থেকে একজন বলে উঠল "কে তুমি"? সন্ন্যাসিনী মাথা তুলে

ফিরে চেয়ে দেখ্‌ল ঠিক তার পিঠের কাছে তারই মত একজন সন্ন্যাসিনী দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না. সে ধীরে ধীরে বল্‌ল,

আমি সন্ন্যাসিনী।

আগন্তুক। এখানে কেন?

স। ঠাঁই নাই।

আ। পৃথিবীতে কোথাও তোমার ঠাঁই নাই?

স। আছে।

আ। কোথায়?

স। "গঙ্গার জলে" এই বলে সে আঙুল দিয়ে গঙ্গার জল দেখিয়ে দিলে।

আ। ওখানে ঠাঁই পেলে কি হবে?

স। ঠাণ্ডা হবো।

আ। কেমন করে?

স। ডুবে মরে।

আ। তুমি বুঝি মরতে এসেছ?

স। হাঁ।

আ। কেন?

স। জীবনটা জ্বলে গেছে।

আ। কিসে?

স। প্রতারণায়।

আ। সব গেছে?

স। সব।

আ। তবে আবার মরবে কেন? সবই যদি গেল মরবার জন্যে তবে আর থাক্‌ল কি? কিছু কি বাকি আছে?

স। আছে।

আ। কি?

স। জ্বালা, ভীষণ জ্বালা।

আ। এ জ্বালা জলে ঠাণ্ডা হবে না।

স। আগুনে পুড়ে?

আ। তাতে ও নয়।

স। তবে কিসে?

আ। মরণ এর পথ নয়।

স। পথ তবে কোনদিকে?

আ। জীবনের দিকে।

স। সে কি রকম, আমি তো তা জানি না।

আ। আমি জানি।

স। জান তো আমাকে দেখিয়ে দাও।

আ। চল আমার সঙ্গে দেখতে পাবে।

এই বলে আগন্তুক সন্ন্যাসিনী তার হাত ধরে তুলে দাঁড করাল। কলের পুতুলের মত পূর্ব্ব সন্ন্যাসিনী পিছু পিছু চল্‌ল, আগন্তুক সন্ন্যাসিনী আগে আগে।

পথে যেতে যেতেই অন্ধকার সরে গিয়ে আলোর

আভাস দেখা দিল। চলতে চলতে আগন্তুক সন্ন্যাসিনী জিজ্ঞসা করল, তোমার নাম কি ?

স। মধুমতী।

আ। বয়স কত ?

স। বাইশ বছর।

আ। বাড়ী কোথা ?

স। বাংলা দেশে।

আ। এখানে এসেচ কতদিন ?

স। একমাস।

আ। কার সঙ্গে ?

স। প্রতারকের সঙ্গে।

আ। কে সে ?

স। সন্ন্যাসী।

আ। তার সঙ্গে কতদিনের পরিচয় ?

স। ছয় বছরের।

আ। কোথায় পরিচয় ঘটে ?

স। নিজের দেশে।

আ। কি সূত্রে ?

স। শিক্ষা সূত্রে, দীক্ষাসূত্রে। তিনি আমার গুরু মন্ত্রগুরু। এখন তিনি আমাকে পথে বসিয়ে পালিয়েছেন। এখানে এনে রেখেই সরে পড়েছেন, আর তার সন্ধান পাচ্ছি নে।

আ। কোথায় আছ?

স। ছিলেম এক সন্ন্যাসীর আড্ডায় এখন ঐ গঙ্গা-তীর যেখানে দেখেছ।

আ। কতক্ষণ গঙ্গাতীরে এসেছ?

স। ঘণ্টা দুই হবে। আড্ডার মধ্যে স্ত্রীলোকের উপর ভীষণ অত্যাচার দেখে যন্ত্রণায় ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি, নিজের জীবনটা তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে গঙ্গার জলে ডুবে মরতে গেছি, ঠাণ্ডা হবার জন্যে, শুধু কেবল জ্বালা নেবাবার জন্যে। আঃ গঙ্গার জল কি ঠাণ্ডা!

আ। ভয় নেই ঠাণ্ডা হবে, এ জ্বালা থাকবে না, উপায় আছে।

স। জানিনা সে কি উপায়।

আ। জানতে পারবে। দেশ ছেড়েছ কতদিন?

স। এক বৎসর।

আ। সন্ন্যাসিনীর বেশ পরেছ কবে থেকে?

স। যবে থেকে দেশ ছেড়েছি।

আ। এতদিন ছিলে কোথায়?

স। কাশী, এলাহাবাদ, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন ঘুরে হরিদ্বারে এসেছি, সন্ন্যাসীদের আড্ডায় আড্ডায় ফিরেছি, মেয়েদের উপর অমানুষিক অত্যাচার দেখেছি; এমন কেউ নাই যে তাদের বাঁচায়, এমন একটা লোকও সেখানে নেই যে তাদের হয়ে দাঁড়ায়। সন্ন্যাস কি পাপ, সন্ন্যাসী

কি পাপী, সন্ন্যাসীর বাসস্থান কি ভীষণ পাপের আড্ডা !

আ। ওকথা বোলো না, সন্ন্যাস পৃথিবীর সব চেয়ে বড় জিনিস। সন্ন্যাসী পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মানুষ, তবে আসল হওয়া চাই। জিনিষ যত বেশী ভালো হবে তার নকল তত বেশী খারাপ করবে। ভালোর নামে, সবাই বশ মানে বলেই ভালো কথা দিয়ে, ভালোর নাম নিয়ে ভালোর পোষাক পরে মানুষ মানুষকে ঠকায়। তা না হলে মানুষ ঠকবে না সবাই জানে। মানুষের যা কিছু টান সব ভালোর উপরে। ভালোর নাম শুনলেই মানুষ পাগল হয়ে ছোটে। তুমিই তার সাক্ষী। ভালো জেনেই তো তুমি সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছিলে ?”

স। নিশ্চয়, খুব ভালো জেনে, সাধু মহাত্মা ভেবে।

আ। “যার নামের পোষাকের এত দর তার আসল জিনিষটার কত দর তাহলে বুঝে দেখ।”

স। ওঃ সেটা খুব বড় জিনিষই হবে, তার দর ও খুব বেশীই হবে, বোধ-হয় বলা যায় না কত ?”

আ। না মোটেই বলা যায় না একেবারেই বলা যায় না সে কেবল অনুভব করে জানতে হয়। তার তো শেষ নেই।”

স। মানুষ সেটা সহজে পায় না কেন ?

আ। সহজ করে মানুষের কাছে সেটা ধরা হয়নি বলে।

স। "কেন ধরা হয়নি, ধরলে মানুষ ঠকে ঠকে এতখানি কষ্ট পেত না।

আ। "অবসর হয়নি, পেতে পেতেই সময় কেটেছে দেবার অবসর হয়নি। আর সাধনাটাও তত পাকা হয়নি। পৃথিবীর মাঝখানে এটাকে অনায়াসে ফেলে দিতে হলে সাধনাটা অনেক খানি পেকে ওঠা চাই।"

স। "আমি কেমন করে আসল সন্ন্যাসীর দেখা পাব কেমন করে চিনবো।"

আ। "তোমার নিজের মধ্যেই তো আসল সন্ন্যাসী রয়েছেন। আর যা ছিল সব তো পুড়ে গেছে, যেটুকু রয়েছে সেটুকু কেবল সন্ন্যাস।"

স। তাকে কেমন করে ব্যবহার করব বলে দাও?

আ। "ঐ সব দুষ্টু ভণ্ড সন্ন্যাসীদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাও। ওদের মেরে দূর করে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও।"

স। কেমন করে তাড়াব তারা যে বলবান।

আ। আমাদেরও বল আছে যদি সবাই এক সঙ্গে জুটি।

স। ঠিক বলেছ, তুমি এর জন্যে আমাকে তৈরী করে নাও।

আ "তাই নেব।"

২

হরিদ্বার জায়গাটির দক্ষিণ পশ্চিম কোণ ঘেঁসে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি আশ্রম। আশ্রমটি বহু-কালের পুরণ। পরে পরে কয়েকজন যোগী এইখানে থেকে নাকি যোগ সাধন করে গেছেন এই রকম শোনা যায়। কেউ তাঁদের দেখেনি লোকের মুখে মুখে এই কথা কেবল রটতে শোনা গেছে। একজন সাধু পুরুষকে এইখানে সবাই দেখেছে ও জানে বলে, লোকেরা তাঁকে 'যোগী মহারাজ' বোলে ডাকত। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তিনি নাকি এ আশ্রমে বাস করেছেন। ইদানিং দু তিন বছর আর তাঁকে দেখা যায় নি, কেউ জানে না তিনি কোথায় গেছেন। 'যোগী মহারাজ' একদিকে যোগের সাধক আর একদিকে অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ ও গীতা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রগুলিতে তাঁর অসামান্য বুৎপত্তি দেখা যেত। আমাদের আগন্তুক সন্ন্যাসিনী দৈবপ্রভা এঁরই শিষ্য, এঁরই হাতের তৈরী। কেমন করে কবে দৈবপ্রভা এঁর কাছে এসেছিল

কেউ জানে না চোদ্দ পনের বছর 'যোগী মহারাজের' আশ্রমে সবাই তাকে দেখছে। 'যোগী মহারাজ' চলে গেছেন আশ্রমটি এখন দৈবপ্রভারই হাতে। অনেকগুলি সন্ন্যা-সিনী নিয়ে দৈবপ্রভা এখানে বাস করে। সন্ন্যাসিনীদের শিক্ষা দীক্ষার সমস্ত ভারই দৈবপ্রভার উপর। সকলকে সে শিখিয়ে তুলছে।

দৈবপ্রভার একটি বিশেষ কাজ হচ্ছে দুরন্ত কাপালিকদের হাত থেকে ভৈরবীদের বাঁচান। কত ভৈরবীকে যে তাদের গ্রাস থেকে সে ছাড়িয়ে এনেছে গুণে শেষ করা যায় না। অনেককে দেশে ফিরে পঠিয়েছে, তারা ঘরের বউ ঝি ঘরে গেছে কেউ জানতে পারেনি এত-দিন কোথায় ছিল। অনেককে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলে, তীর্থে তীর্থে আডডা তৈরী করে তাদের সেখানে রেখেছে ঐ রকম সব মেয়েদের বাঁচাবার জন্যে। যারা এখনো তৈরী হয়নি তাদেরই কেবল নিজের কাজে রেখে তৈরী করচে।

এহেন সন্ন্যাসিনী দৈবপ্রভার সঙ্গে আজ গঙ্গা-তীরে মধুমতির দেখা হয়েছে।

দুজনে এসে তারা আশ্রমের মধ্যে ঢুকল। দৈব-প্রভাকে দেখে আশ্রমের সব সন্ন্যাসিনীরা দৌড়ে এসে ঘিরে দাঁড়াল। নতুন একটি সন্ন্যাসিনীকে দেখে চোখে মুখে তাদের আনন্দ ফুটে উঠল, বুঝল তাদেরই মত একজন।

কয়েক দিন আশ্রম বাস করেই মধুমতী অনেকটা শান্তি পেয়েছে। তার সে রকম অস্থিরতা সে রকম ছট-ফটানি আর নেই। শিক্ষা দীক্ষা দৈবপ্রভার কাছে রীতিমতই চল্‌ছে। একদিন দৈবপ্রভা বল্লে "এইবার আমাদের তীর্থে যেতে হবে সময় হয়েছে।" মধুমতী বল্ল "তীর্থে যাবে কেন, দেবতা দেখতে" ?

দৈ। দেবতা তো তীর্থে নেই তাকে দেখতে তীর্থে যাব কেন ?

ম। "দেবতা তবে কোথায় ?" দৈবপ্রভা নিজের বুকের উপর হাত দিয়ে বল্ল "এই এখানে।"

ম। "দেবতা কি কেবল বুকেই থাকেন ?"

দৈ। না, বুকে, চোখে, বুদ্ধিতে, মনে, জ্ঞানে, ঘুমের শান্তিতে, জেগে থাকার কাজে, সব জায়গায়ই দেবতা ভরে আছেন।

ম। মানুষ তবে দেখ্‌তে পায় না কেন ?

দৈ। আগে অনুভব করতে পারলে তবে তো দেখ্‌তে পাবে ?

ম। অনুভব হয় না কেন ?

দৈ। অনুভব শক্তি পরিষ্কার নয় বলে, তাতে ময়লা ধরে আছে বলে।

ম। কেমন করে তাকে পরিষ্কার করে তোলা যায় ?

দৈ। শরীরকে খাটালে, মনকে কোন নোংরা জিনিষ ছুঁতে না দিলে, জ্ঞান চর্চ্চা করলে, বুদ্ধিকে প্রতি কাজে জাগিয়ে রাখলে, আর পাপ না করে আত্মাকে প্রসন্ন রাখতে পারলে।

ম। পাপ কি ?

দৈ। আত্মার যাতে কষ্ট তাই পাপ।

ম। আত্মাকে যদি কেউ বুঝতে না পারে ?

দৈ। পাপকে ও বুঝতে পারবে না।

ম। তাহলে কি করবে ?

দৈ। পাপ করবে, কষ্ট ও পাবে।

ম। কে তাদের বাঁচাবে ?

দৈ। যে পারে ?

ম। যদি কেউ না পারে ?

দৈ। বাঁচবে না, মরবে, মরে মাটির সঙ্গে মিশবে, তাদের উপর দিয়ে গাছ পালা বেরবে, সে সব পৃথিবীর কাজে লাগবে।

ম। তোমার কথা শুনলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

দৈ। তোমার ও কথা শুনে পরে মানুষ অবাক্ হয়ে যাবে।

মধুমতী চুপ করে রইল, কথাগুলো, কথার ভাবগুলো মনের মধ্যে যেন থিতিয়ে বসতে চাইছে, একটু নাড়া পেলে যেন গুলিয়ে যাবে।

মধুমতী অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করল, "তীর্থে কবে যেতে হবে ?

দৈ। কালই।

দৈবপ্রভার যেমন কথা অমনি কাজ সুরু। তার শরীর মন বুদ্ধির কোনখানে যেন কিছুমাত্র জড়তা নেই। সমস্তটাই নিরলস, আগাগোড়াই যেন ঝরঝর তরতর করছে।

তখুনি স্থির হয়ে গেল কাল ভোরেই তীর্থের জন্য বেরতে হবে।

সন্ন্যাসিনীর দল মহা খুসী। নূতন জায়গায় যাবে চারদিক দেখবে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবে এতে তাদের বড় আনন্দ। উৎসাহের সঙ্গে তারা আয়োজনের কাজে লেগে গেল। দৈবপ্রভার কথামত একরাশ ছোলা, একরাশ কাঁচা চিঁড়ে, গাওয়া ঘিতে পাক করা, বড় থলের এক থলে সুজির লাড়ু, আশ্রমের গাছের শুকিয়ে রাখা বাদাম থলে ভরে বেঁধে সঙ্গে নিল: এ ছাড়া পথে যেখানে যা যোগাড় হয় বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে অনেক ফল মূল তুলে নিতে পারবে, নদী আর ঝরণার জল তো আছেই। তারা বাইশ জন, প্রত্যেকের সঙ্গে একটা করে কম্বল আর মোটের উপর গোটা পাঁচ ছয় ঘটি। মোটামুটি এই তাদের পথের সম্বল। লুকন ছোরা দুচার খানা সঙ্গে অবশ্য যাবে।

আয়োজন সেরে সন্ধ্যা হতেই সন্ন্যাসিনীর দল শুয়ে পড়ল খুব ভোরে উঠতে হবে বলে।

সবাই ঘুমচ্ছে মধুমতীর চোখে ঘুম নেই। দৈবপ্রভার দিনের কথাগুলো তার বুকের উপর যেন আসন বিছিয়ে বসেছে। তাদিকে সে সরাতে পারছে না। একলাটি উঠে আশ্রমের ভিতরকার প্রকাণ্ড একটা বটগাছের তলায় গিয়ে সে বসল। পায়ের শব্দে গাছের ঘুমন্ত বাদুড়গুলো একবার ডানা ঝাড়া দিয়ে নড়ে উঠল, তারপর আবার সব চুপ। মধুমতী তখনও অন্যমনস্ক, সে নিজের মনে গাইছে—

আছ যদি কেন আসিছ না কাছে
কেন হয়ে আছ দূর পরবাসী
কেনহে এমনে রয়েছ গোপনে.
প্রাণ মনে কেন উঠিছ না ভাসি

আজ মধুমতীর মনটা বড় শূন্য সব যেন খালি একটু থেমে আবার মধুমতী গাইতে লাগল

থাক যদি তবে থাকিওনা দূরে,
মনে এস মম মনোসাধ-পুরে,
শুনি আছ তবু হিয়ায় না ধরে
তোমা লাগি প্রাণ হয়েছে উদাসী।

মধুমতীর গলার আওয়াজ কি মিষ্টি, গানের সুরে চারদিকটাকে যেন মধুময় করে তুলল, নিজের গানে সে নিজেই বুকের মধ্যে অনেকখানি আরাম পেতে লাগল,

আপনার মনে বলে উঠল “আকাশ কি সুন্দর।” পাশ থেকে হঠাৎ দৈবপ্রভা ডাক্‌ল “মধুমতী এখানে” ?

ম। হাঁ।

দৈ। কি করছ ?

ম। বসে আছি মনটা আজ কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।

দৈ। কেন ?

ম। দেবতা নেই।

দৈ। আছেন বৈকি, না থাকলে তুমি চাইবে কেন ?

ম। চাইছি তো পাচ্ছি কই ?

দৈ। চাও, আরো বেশী করে চাও, দিনরাত চাও, খেতে শুতে, উঠতে বসতে, চল্‌তে ফিরতে, ঘুমিয়ে জেগে যখন মনে পড়ে তখুনি চাও, চাইতে চাইতেই পেয়ে যাবে।

ম। অন্ধকার যেমন করে আমাকে চাওয়ায় দিন তা পারে না।

দৈ। অন্ধকারই যে চাওয়া, দিনটা যে পাওয়া; অন্ধকারে একলা বসে চাইতে চাইতেই দিনের আলোয় পেয়ে যাবে।

ম। অন্ধকার কি চায় ?

দৈ। পেতে চায়।

ম। কাকে ?

দৈ। নিজেকে।

ম। কোথায় ?

দৈ। বাইরে।

ম। কিসের মধ্যে ?

দৈ। দিনের মধ্যে।

ম। কেমন করে ?

দৈ। নিজেকে আলোয় ফুটিয়ে তুলে।

ম। দিনের কি মোটেই চাওয়া নেই ?

দৈ। আছে।

ম। সে কি চায় ?

দৈ। দিতে।

ম। কাকে ?

দৈ। নিজেকে।

ম। কোথায় ?

দৈ। পৃথিবীতে।

ম। কিসের মধ্যে ?

দৈ। প্রাণের মধ্যে।

ম। কেমন করে ?

দৈ। পৃথিবীকে প্রাণ দান ক'রে।

ম। পৃথিবীটা প্রাণ দান পেলে কি হবে ?

দৈ। চারদিকটা জেগে উঠে কাজ চল্‌তে থাকবে। সব কিছুকে পাওয়া যাবে।

ম। অন্ধকারে কি পাওয়া তবে কিছুই নেই ?

দৈ। আছে বই কি, সবই সেখানে মজুত আছে কেবল অন্ধকারে যেটা খুঁজে পাওয়া যায় না দিনে সেটা স্পষ্ট। অন্ধকারে যেটা থাকে দিনে সেটা কাজ করে তাই মানুষ সেটাকে জলজ্যান্ত দেখতে পায়।

ম। অন্ধকারের চাওয়াটাকেই বুঝি দিনের মধ্যে পাওয়া যাবে ?

দৈ। হাঁ। অন্ধকারে চেয়ে, আলোর মধ্যে পেয়ে, পৃথিবীকে দিয়েই ছুটি।

ম। তোমার মধ্যে কি মস্ত বড় প্রাণ রয়েছে, যখনি কাছে এস যেন প্রাণ পাই, বেঁচে উঠি, মনটা জেগে ওঠে, চারদিকটা সচেতন বলে অনুভব হয়, বুদ্ধি যেন জ্বলতে থাকে।

দৈ। তোমার প্রাণ যে কত স্নিগ্ধ কত গভীর তাকি জান ?

দুজনে উঠে বাড়ীর দিকে চল্‌ল। যেতে যেতে মধুমতী মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়ায়। দৈবপ্রভা বল্‌ল "থাম কেন ?"

ম। আকাশটা মাথার উপর জাগিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে বড় ভাল লাগে।

দৈ। বেশ, চল বাইরে একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।

দুজনে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, চলতে চলতে মধুমতী বলল "তোমার কাছে একটা কথা আমার জানবার আছে।

দৈ। কি বল ?

ম। তীর্থ কি?

দৈ। কবির মনের রূপ যেমন কাব্য, ভক্ত সাধকের আত্মার রূপ তেমনি তীর্থ; কবি রচনা করে মানুষ পড়ে, সাধক মূর্ত্তি গড়ে মানুষ দেখে।

ম। কাব্য পড়লে কবির মনের রূপগুলো ধরা যায়; তীর্থ দেখলে সাধকের আত্মার রূপগুলো ধরা যায় কি?

দৈ। চর্চ্চা করলেই জানা যায়। কবি যেমন নিজের অনুভূতি গুলো কাগজের পাতায় কালির অক্ষরে গেঁথে রাখে, সাধক ও তেমনি সাধনায় পাওয়া নিজের আত্মার রূপগুলো কাঠ পাথরে খুদে রেখেছে। খোঁজ করলেই জানা যাবে তাদের আসল অর্থ কি।

ম। আচ্ছা মূর্ত্তিগুলির আকার ভিন্ন ভিন্ন কেন?

দৈ। সকল কবির অনুভূতি যেমন এক নয়, সকল সাধকের উপলব্ধি ও তেমনি এক নয়। এক এক কবির অনুভূতি এক এক রকম, এক এক সাধকের উপলব্ধিও এক এক রকমের।

ম। কবি তো নিজের কাব্যকে ইষ্টদেবতা বলে না সাধকরা মূর্ত্তিকে ইষ্টদেবতা বলে কেন?

দৈ। যে সত্যিকার কবি নিজের রচনাকে তার ইষ্ট দেবতার মত প্রিয় বলেই বোধ হয়। আত্মা সকলের চেয়ে ভালো, ভক্ত সাধক নিজের আত্মার রূপকে তাই ইষ্টদেবতা অর্থাৎ 'আমার ভালো' নাম দিয়েছে।

ম। আচ্ছা এইমূর্ত্তিগুলি কি চিরকাল থাকবে?

দৈ। না তা কখনও থাকবে না, কাঠ পাথর কখনই চিরকাল থাকবে না, সময়ে এগুলি লোপ পাবেই, কত কত মূর্ত্তি ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেছে জানই তো, কিন্তু এই মূর্ত্তিগুলির, রূপগুলির ইতিহাস মানুষকে লিখে রাখতে হবে। তা নাহলে মনুষ্য ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

ম। কেন?

দৈ। মানুষ তো একই রকম রূপের মধ্যে চিরকাল আত্মাকে উপলব্ধি করে চুপ করে বসে থাকবে না, কালে কালে কত নূতন নূতন রূপের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করতে থাকবে, তার প্রত্যেকটির ইতিহাস অক্ষরে অক্ষরে লিখে রাখতে হবে, তবেই বোঝা যাবে মানুষ সত্যি সত্যি কি জিনিষ?

ম। মানুষ একেকালে সাপ্ সাধনা, ব্যাঙ সাধনা, ভূত, প্রেত, পিশাচ সাধনা, রাক্ষস সাধনা কত কি উৎকট বিকট সাধনা করেছে সব কি লিখে রাখতে হবে?

দৈ। সব, সব,। যেখানে যখন যা কিছু সাধনা যে কোন মানুষ করেছে তার সমস্ত ইতিহাস লিখে রাখতে হবে—যতদূর পাওয়া যায়। মানুষের পূর্ব্বপুরুষ যদি বাঁদর হয় তাও তো মেনে নিয়ে লিখে রাখতে হচ্ছে? কত রকমের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি মানুষের ছিল ও আছে

সব গুলোকে চেয়ে দেখতে হবে, কোনটার সম্বন্ধে চোখ বুজলে চলবে না ?

ম। ক্রমে ক্রমে সাধনার রাজ্য অনেক বদলে যেতে থাকবে ?

দৈ। নিশ্চয় ; পৃথিবীর সব জিনিষ যে রকম বেড়ে গিয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে, মানুষের আত্মা ও তেমনি বেড়ে গিয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠবে। সাধনার রূপ অনেক বদলে যাবে, অনুভূতি উপলব্ধি ধারণা ঢের বেড়ে যাবে,— অনেক বেড়ে যাবে। মানুষের মধ্যে আত্মা কত বড় হয়ে ফুটে উঠবে বলাই যায় না। তখন পৃথিবী মানুষের কাছে আবার নূতন হয়ে দেখা দেবে। এই পৃথিবীই তখন মানুষ দেখবে সম্পূর্ণ আর এক রকম।

কথা শুনে মধুমতী অবাক্ হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল, পরে আস্তে আস্তে বল্‌ল "তুমি তো ঘরে বসেই সব পাচ্ছ দেখ্‌ছি তোমার আবার তীর্থে যাওয়া কেন" ?

দৈ। দুরন্ত কাপালিক ও দুষ্ট সন্ন্যাসীদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাবার জন্যে। তীর্থে তীর্থে তাদের আড্ডা, তাই তীর্থে তীর্থে ঘুরে আমি তাদের আড্ডা ভাঙ্গতে চেষ্টা করি। এটা আমার ধর্ম্ম। মেয়েদের বাঁচাতে হবে তা যেমন করেই হোক্। স্থির হয়ে মধুমতী শুনলো, মনের মধ্যে কত কি আন্দোলন

হতে লাগলো, কোন কথা আর জিজ্ঞাসা করল না।

কথায় কথায় রাত এদিকে শেষ হয়ে এসেছে তাড়াতাড়ি দুজনে বাড়ীর দিকে ফিরল সে রাত্রে তাদের আর ঘুম হল না। ভোর হতেই দৈবপ্রভা দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল। আশ্রমের দুয়ার রইল খোলা যে ইচ্ছা আসুক যার ইচ্ছা থাকুক।

৩

গয়া জেলার রাজগীর জায়গাটির স্থানে স্থানে ছোট বড় অনেক পাহাড় দেখা যায়। তারই একটা বড় গোছ পাহাড়ের পাশ দিয়ে একদিন সন্ধ্যার সময় একদল সন্ন্যাসিনী চলেছে। নিজেদের মধ্যে তারা খুব গল্প করতে করতে যাচ্ছে ; মুখে বা কথাবার্ত্তার ভাব ভঙ্গীতে ভয় ভাবনার চিহ্ন মাত্র দেখা যাচ্ছে না। রাত্রি এসে পড়েছে, বাঘ, ভালুকের ভয়, দুষ্টু মানুষের ভয়, নির্দ্দিস্ট বাসস্থান না থাকার ভাবনা, খাবার ভাবনা কোন ভাবনাই তাদের নেই। সব কিছুকে মাড়িয়ে, সব কিছুকে ছাড়িয়ে চলবার জন্যেই যেন তারা তৈরী।

এরাই যে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত দৈবপ্রভার দল তা বোধ হয় বলে বোঝাতে হবে না।

ক্রমে চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। আর পথ চলা

যায় না। পাহাড়ের কাছে জঙ্গলের মধ্যে একটা ভাঙ্গা পোড়ো বাড়ী দেখে রাতের মত সন্ন্যাসিনীরা সেখানে আশ্রয় নিল। সূর্য্যাস্তের আগেই তাদের খাওয়া দাওয়া চুকে যায় তাই রাতে সে সবের আর কোন হাঙ্গাম নেই।

খানিকক্ষণ গল্প করে একে একে অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ল। মধুমতী ও দৈবপ্রভা জেগে! মধুমতী জিজ্ঞাসা করল "তুমি ঘুমোবে না?"

দৈ। এখন না।

ম। তবে কখন?

দৈ। যখন সময় হবে।

ম। এখনো সময় হয়নি? রাত যে প্রায় দুপুর পেরিয়ে গেছে।

দৈ। যতক্ষণ কাজ থাকে ততক্ষণ আমার ঘুম আসে না।

ম। এখানে আবার কি কাজ, এই জঙ্গলের মধ্যে?

দৈ। কাজ আছে, যত দুষ্ট দুরদান্ত কাপালিক ভণ্ড-সন্ন্যাসীদের সাধন ভজন পাপাচরণের এই তো সময়। দেখ্ছ না সামনেই শ্মশান।

মধুমতীর চেয়ে দেখ্ল খানিকটা দূরে, এক খণ্ড জমির উপরে, এদিক ওদিক দু চারটে শেয়াল কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদেরই মুখের, দু এক টুক্রো কুড়িয়ে

পাওয়া হাড় চিবানোর শব্দ থেকে থেকে এক একবার শোনা যাচ্ছে। নিভানো চিতার শেষ আগুনের অস্পষ্ট রাঙা চিহ্ন ছাইয়ের গাদার ভিতর থেকে তখনও উঁকি দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে থাকতে দেখা গেল চিতার ছাইগুলো কি সে যেন নাড়ছে উপর থেকে ছাইগুলো সরে যাওয়াতে তলার আগুন স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে পড়ল, তখন দেখা গেল একজন মানুষ আগুনের উপর কতকগুলো কাঠ চাপাচ্ছে। খানিকক্ষণ ধুঁইয়ে কাঠগুলো দপ্ করে জ্বলে উঠল। জ্বলন্ত আগুনের সামনে একজন কাপালিক দাঁড়িয়ে, গলায় জবা ফুলের মালা, কপালে মস্ত বড় রক্ত চন্দনের ফোঁটা, তার নীচে তিন সার রক্ত চন্দনের দাঁড়ি টানা; বুকের ঠিক মাঝখানটিতে সিঁদুর দিয়ে ত্রিকোন চিহ্ন আঁকা; পরণে হলুদে ছোপান একখানা মোটা ধুতি তার উপর কোমরে লাল রঙের এক গামছা বাঁধা। সাধন ভজনের সরঞ্জামগুলি মাটিতে নামিয়ে রেখে আগুনে কাঠ দিয়ে কাপালিক আগুণটা আগে জ্বালিয়ে তুলছে।

কাপালিকের বয়স খুব বেশী নয় আন্দাজ ছত্রিশ সায়ত্রিশ হবে। চেহারা দিব্য সুশ্রী, উজ্জ্বল গৌর রঙ. শরীরের গড়ন বলিষ্ঠ ও সুন্দর। কিন্তু উৎকট সাধনায় সমস্ত চেহারায় এখন যে একটি বিকট ভাবদেখা দিয়াছে

সেটা ভেদ করে সুন্দর বলে কোন কিছু আর ধরাই যায় না। দেখলেই মনে হয় বিশ্রী ও ভয়ঙ্কর।

মধুমতী কখনো কাপালিক দেখেনি, বিস্মিত হয়ে সে দৈবপ্রভাকে জিজ্ঞাসা করল, "এ কে?"

দৈ। "চুপ।"

মড়ার আসন, মড়ার মাথার খুলিতে মদ মাংস প্রভৃতি শব সাধনার আর সব উপকরণ ছাড়া একটি দশ বার বছরের ছেলে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে দেখা গেল।

আলতায় ছোপান লাল রঙের এক টুকরো কাপড় দিয়ে মুখখানি তার ঢাকা। ছেলেটি মরা কি জ্যান্ত বোঝা যায় না। যদি ও বেঁচে থাকে তবে অজ্ঞান হয়ে আছে বলতেই হবে কেন না একেবারেই স্থির, একটুও নড়ছে না।

মধুমতী ভাবল ছেলেটি মৃত,, একেই দাহ করতে লোকটি এনে থাকবে, আগে চিতা জ্বলছে।

দৈবপ্রভা জানে আসল ব্যাপারটা কি। কাপালিক সম্বন্ধে অনেক খবরই দৈবপ্রভা রাখে দেখা গেছে, কেন তা জানা যায় নি।

চিতার আগুন দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। কাপালিক তার উপর মাটির হাঁড়িতে কি একটা সিদ্ধ করতে চাপিয়ে দিল। তার পর এটা ওটা যোগাড় করে মড়ার আসনে জপে বসল। জপের আরম্ভে মড়ার মাথার খুলিতে রাখা

খানিকটা মদ ও এক টুকরো মাংস খেয়ে নিল। মাংসটা কিসের জানা গেল না। লোকে সন্দেহ করে কাপালিকরা মানুষের মাংস খায়।

দশ মিনিট হয়ে গেল কাপালিক জপই করছে, আরো খানিকটা সময় কাটল জপের শেষ নেই। ক্রমেই সে জপের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে বোধ হল, বাহ্যজ্ঞান প্রায় নেই বল্লেই হয়।

ঠিক সেই সময় দৈবপ্রভা উঠে দাঁড়াল। মধুমতীকে উঠতে ঈসারা করে, সন্ন্যাসিনীদের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে, কি বলে, তাদের জাগিয়ে সকলে মিলে সার বেঁধে জঙ্গলের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে একেবারে কাপালিকের পিছনে উপস্থিত হল।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করে, সবাই একসঙ্গে পড়ে, পিছমোড়া করে কাপালিকের হাত দুটো মোটা পুরু একখানা বড় গামছা দিয়ে তার চোখ দুটো চকিতের মধ্যে বেঁধে ফেলল।

নেশার ঝোঁকেও জপের তন্ময়তায় ব্যাপারটা ভালো রকম বুঝতে না পেরে কাপালিক গর্জ্জন করে বলে উঠল, কে তুমি?

দৈ। আমি শক্তি।

কাপালিক রাগে গর্জ্জন করতে করতে আবার বলে উঠল, কিসের শক্তি?

দৈ। সাধন শক্তি।

কা। কার সাধন শক্তি ?

দৈ। তোমার।

কাপালিক জড়িত গলায় আমতা আমতা করে বল্‌ল। আমার সাধন শক্তি ! কবে জাগ্রত হল ?

দৈ। এইবার হয়েছে।

কা। কি তার রূপ?

দৈ। উৎকট বিকট ভয়ঙ্কর ; দেখতে পাচ্ছ না ?

কা। না আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না ?

দৈ। "তবে কিছুদিন অন্ধকারেই থাক। অন্ধকারের মধ্যে নিজের শক্তির রূপটা আগে ভাল করে দেখে নাও তবে চোখ খুলে দেওয়া হবে।" ইতিমধ্যে সন্ন্যাসিনীরা কাপালিকের পা দুটি ও বেঁধে ফেলেছে। দৈবপ্রভার কথা শুনে চোখ বাঁধা অবস্থায় থাকতে হবে জেনে হাত পা ছোঁড়ার চেস্টা করে, কাপালিক ভীষণ চীৎকার আরম্ভ করল। বৃথা চেস্টা, বাঁধন একটুখানিও আলগা করতে পারল না। শেষে নিরুপায় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকতে বাধ্য হল।

সন্ন্যাসিনীরা ধরাধরি করে তাকে ভাঙ্গা বাড়ীটার মধ্যে নিয়ে গিয়ে ফেলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রাত পুইয়ে গেল। ছেলেটি সন্ন্যাসিনীদের যত্নে ইতিপূর্ব্বেই বেঁচে গিয়েছিল। সকাল হতেই দৈবপ্রভার কথা মত

দুতিনজন সন্ন্যাসিনী গিয়ে তাকে গ্রামের ভিতর ছেড়ে দিয়ে এল। যাদের ছেলে তাদের কাছে ফিরে গেল কোথায় গিয়েছিল কেন গিয়েছিল কেউ জানল না।

৪

সাতদিন হয়ে গেল ভাঙ্গা বাড়ীর একটা ঘরে চোখ হাত পা বাঁধা অবস্থায় কাপালিক পড়ে আছে। সন্ন্যাসিনী-দের ভিতর কেউ একজন দিনের মধ্যে একবার এসে ঘরটা পরিস্কার করে তাকে কিছু খাইয়ে যায় এই পর্য্যন্ত। আজ দৈবপ্রভা কাপালিকের কাছে যাবে বলেছে। মধুমতী বল্ল সেও সঙ্গে যাবে। দুজনে যাচ্ছে মধুমতী জিজ্ঞাসা করল, "একে তুমি অমন করে বেঁধে ফেলে রেখেছ কেন ?"

দৈ। দরকার আছে।

ম। কি দরকার ?

দৈ। ওর শক্তিকে বদলে দিতে হবে। পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু উৎকট যা কিছু বিকট, যা কিছু ভয়ঙ্কর তার উপর জয় লাভ করাই কাপালিকদের সাধনার লক্ষ্য। এর জন্যই তারা আত্মশক্তি বা আত্মচৈতন্যকে উৎকটতর, বিকটতর অধিকতর ভয়ঙ্কর করে তুলে এদের উপর জয় লাভ করতে চেষ্টা করে। এতে করে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তাদের আত্মার সামঞ্জস্য নষ্ট হয়ে যায়, আত্মা নিজের স্বাভাবিক অবস্থা হারায়। কিন্তু এর দ্বারা নিজের

অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওরা খুব সচেতন হয়ে উঠে নিজের অস্তিত্বকে এক মুহূর্ত্ত ভুলে থাকতে পারেনা। এখুনি তার প্রমাণ দেখতে পাবে।"

বল্‌তে বল্‌তে দৈবপ্রভা ও মধুমতী কাপালিকের ঘরের মধ্যে ঢুক্‌ল।

দৈবপ্রভা জিজ্ঞাসা করল "কেমন আছ ?"

কা। ভয়ানক কষ্ট।

দৈ। কিসের কষ্ট ?

কা। চোখ হাত পা বেঁধে পড়ে থাকার একটা ভয়ানক কষ্ট, তাছাড়া বাইরের কিছু দেখতে শুনতে না পাওয়ায় নিজের অস্তিত্বকে খুব বেশী করে অনুভব হয় তার এক ভীষণ যন্ত্রণা।

দৈ। সাধনার দ্বারা নিজের অস্তিত্বকে যে উৎকৃষ্ট শক্তির মধ্যে এতদিন ধরে জাগিয়ে তুলেছ তার ভীষণতা, উগ্রতা একবার অনুভব কর।

কা। ভয়ানক, ভয়ানক, অত্যন্ত ভয়ানক কি ভীষণ শক্তি। মৃত্যু হোক আমার মৃত্যু হোক, অস্তিত্বের উগ্রতায় উৎকটতায় আমার আত্মা যেন ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

দৈ। শান্ত হও, কাপালিক শান্ত হও, নিজের অস্তিত্বকে শান্ত রূপে ভাবনা করতে চেষ্টা কর সহজে শান্তি পাবে।" কাপালিক মূর্চ্ছিতের মত মাটিতে পড়ে রইল, দৈবপ্রভা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

৬

এবার একমাস পরে দৈবপ্রভা এল, সঙ্গে মধুমতী। ঘরের মধ্যে ঢুকে দাঁড়িয়ে দৈবপ্রভা জিজ্ঞাসা করল, "এখন কেমন আছ ?"

কা। অবশ, মৃত্যুর মত অবশ, অন্ধকারের মত জ্যোতিহীন, মাটির নীচে চাপা পড়া প্রাণীর মত রুদ্ধশ্বাস, ইন্দ্রিয় বোধ-শূন্য জড়পিণ্ড, এ ছাড়া আর কিছু নই।"

দৈ। শীঘ্র বেঁচে উঠবে কাপালিক ! শীঘ্র বেঁচে উঠবে, তোমার সাধনার একটি ফল এখন অনেকখানি কাজ দেবে। নিজের অস্তিত্বকে সে কখনো ভুলতে দেবে না। দিনরাত তুমি নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করবে, আর অন্ধকার ক্রমাগত তাকে শান্ত করতে থাকবে। অন্ধকারের নামই শান্তি ; সেতো এক মুহূর্ত তোমাকে ছেড়ে নেই।

কা। আমি তো দেখছি অন্ধকার প্রতিদিন আমাকে একটু একটু করে মেরে ফেলছে ; আমার কাছে সে মৃত্যুর মত ঠাণ্ডা, গতিশূন্য জড়।

দৈ। অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবে সে গতিশূন্য জড় নয় সে শান্তিময় চেতন ; কিছু দিন পর তুমি নিজেই বলবে অন্ধকারের মধ্যে আমি শান্তি পেয়েছি।

কা। এখন কিন্তু সে আমাকে কেবলই মারছে, মৃত্যুর গহ্বরের মধ্যে টেনে নিয়ে ফেলছে। এ মৃত্যু, এ কখনো জীবন হতে পারে না।

দৈ। সে তোমার অস্তিত্বের উগ্রশক্তিকে মেরে ফেলছে অস্তিত্বকে নয়; তুমি কি বলতে চাও তোমার অস্তিত্ব মরবে?

কা। না অস্তিত্ব মরবে না, কিন্তু সে যে এর পর কি ভাবে থাকবে তা আমি বুঝতে পারছি না।

দৈ। শান্ত ভাবে, অন্ধকারের মত স্থির শান্ত ভাবে। কাপালিক চুপ করে রইল, মনে হল কথাগুলো যেন খুব ভালো করে বুঝতে পারল না।

৫

ছয় মাস কেটে গেছে! এর মধ্যে একদিনও দৈবপ্রভা কাপালিকের কাছে যায়নি। মধুমতী দৈবপ্রভাকে বল্ল "আর কতদিন তাকে এইভাবে ফেলে রাখবে? এইবার বাইরে নিয়ে এস।"

দৈ। "এখনো সময় হয়নি।" শান্ত হতে দাও, ভালো করে শান্ত হতে দাও; যখন সহজে সব শান্ত হয়ে আসবে তখনই বেরবার সময় হবে।"

ম। "তার যে বড় কষ্ট হচ্ছে, এমন করে কি বেশী দিন থাকা যায়? এত কষ্ট দিতে হচ্ছে কেন?"

দৈ। "উপায় নেই, দিতেই হবে; তাকে কষ্ট দিতে গিয়ে আমিও খুব কষ্ট পাচ্ছি, সহ্য করতে হচ্ছে।"

ম। তুমি কি ওকে আগে থেকে জানতে?

দৈ। হাঁ।

ম। কত আগে?

দৈ। বিশ বছর আগে।

ম। কোথায় দেখেছিলে?

দৈ। নিজের দেশে।

ম। দেশ তোমার কোথায়?

দৈ। গোপালপুর।

ম। কোন জেলা?

দৈ। বর্দ্ধমান জেলা।

ম। দেশে কে আছে?

দৈ। এখন কেউ নেই।

ম। কে ছিল?

দৈ। "বাপকে আমার মনে নেই আমি ছোট থাকতেই তিনি মারা যান, মা ছিলেন, স্বামী ছিলেন।"

ম। তাঁরা এখন কোথায়?

দৈ। "ষোল বছর হল হরিদ্বারে কলেরা রোগে মায়ের মৃত্যু হয়েছে।"

ম। স্বামী?

দৈ। "এই ভাঙ্গা বাড়ীর অন্ধকার ঘরে চোখ হাত পা বাঁধা পড়ে আছেন। কথা শুনে বিস্ময়ে মধুমতী যেন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল; চোখ দুটো বড় বড় করে মেলে

অবাক দৃষ্টিতে দৈবপ্রভার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বলে উঠল,

কাপালিক তোমার স্বামী ?

দৈ। হাঁ।

ম। তবে কেন তাকে এত কষ্ট দিচ্ছ ?

দৈ। সেই জন্যই তো কষ্ট দিচ্ছি, এ না হলে আমি তাঁর সঙ্গে মিলতে পারিনে।

ম। অদ্ভুত কাণ্ড।

দৈ। তা ঠিক।

ম। স্বামীর সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল কেন ?

দৈ। তিনি কাপালিকদের সঙ্গে মিশে শবসাধনা করতেন, মা বা আমি কেউ টের পাইনি ; হঠাৎ একদিন জানা গেল নরবলি দেওয়ায় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ফেরার হয়েছেন।

ম। হরিদ্বারে গিয়াছিলে কেন ?

দৈ। মনের দুঃখে মা আমাকে নিয়ে তীর্থ করতে বেরলেন, হরিদ্বার পৌঁছে কলেরায় তাঁর মৃত্যু হল, আমি পিতাজীর হাতে পড়ে বেঁচে গেলুম।

ম। যোগী মহারাজকে তুমি পিতাজী বলতে ?

দৈ। হাঁ, তিনি আমার শিক্ষাদাতা, জ্ঞানদাতা, পিতা, গুরু ; আবার আর একদিকে সন্তান তুল্য। তাঁর আশ্চর্য্য স্নেহ ছিল মানুষের উপরে।

ম। স্নেহের এমন আশ্চর্য্য শক্তি তুমি ও তাই লাভ করেচ, স্বামীকে এখন বাঁচিয়ে তোলো।

দৈ। চেষ্টা তো করছি।

ম। তোমাদের আসল নাম কি?

দৈ। আমার নাম সুব্রতা তাঁর নাম দেবনন্দন। এই বলে দুজনে উঠে কাপালিকের ঘরে দিকে চল্‌ল।

যেতে যেতে মধুমতী গাইছে—

অন্ধকারে হৃদয়খানা
ভরলে আমার কালো রূপে,
লুকিয়ে এসে দিনের দাহ
জুড়িয়ে দিলে চুপে চুপে।
পেয়ে তোমার অমৃত দান
হারায় না সুর ফুরায় না গান
এমনি করে জ্বালিয়ে তোলো
দিনের আলোয় গন্ধে ধূপে।

ঘরে ঢুকেই দৈবপ্রভা জিজ্ঞাসা করল "এখন কেমন আছ?"

কা। শান্তি পেয়েছি। এখানেই থাকি আর যেখানেই যাই কিছু আসে যায় না। এখানে ও বেশ পড়ে আছি। ভগবানের দয়া আমার উপর এসেছে; তুমি কে আমাকে বাঁচিয়েছ বল?

দৈ। আমি সন্ন্যাসিনী।

কা। কোথায় থাক ?

দৈ। হরিদ্বারে তা ছাড়া যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই।

কা। আমাকে যখন বাঁচিয়েছ তখন আর একটা কথা আমি জানতে চাই। শশ্মানে পাপাচরণ করে, শবসাধনায় মানুষ বলি দিয়ে, শশ্মানের কাছে ও মানুষের কাছে আমার গুরুতর অপরাধ হয়েছে। আমাকে বলে দাও তার বদলে শশ্মানের জন্যে ও মানুষের জন্যে আমি কি করতে পারি ?

দৈ। শ্মশানে পাপাচরণ করে চিরদিন যে শ্মশানকে অপরিস্কার করে এসেছো তার বদলে এখন শ্মশান পরিষ্কার করার ভার নাও। শশ্মানে যারা কাজ করে তারা মুর্দ্দাফরাস, তাদের জ্ঞান নেই, শশ্মান ভাল রকম পরিষ্কার রাখতে তারা জানেনা। তুমি কাজ করলে শ্মশান খুব পরিষ্কার থাকবে, দুর্গন্ধের বদলে শ্মশানের আকাশ সুগন্ধে ভরে উঠবে; আর নরবলি দিয়ে জ্যান্ত মানুষকে মৃতদেহে পরিণত করে যে অপরাধ করেছ তার বদলে এখন অনাথদের মৃতদেহ সৎকারের ভার নাও। যাদের সৎকারের লোক নেই তুমি তাদের সক কর।

কাপালিক উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, "চমৎকার ব্যবস্থা, কাল থেকেই আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হবো এতে আমার বিশেষ আনন্দ আছে।" দৈবপ্রভা বলল; বেশ

ভালো, আমিও এ কাজে যোগ দেব, তোমার সঙ্গে প্রতি দিন শ্মশান পরিস্কার করব, অনাথ মৃতদের দেহ শ্মশানে বহে নিয়ে আসব।

কা। কেন, তুমি কেন করবে; তুমি তো কোন পাপ করনি তবে তুমি কেন দণ্ড স্বীকার করবে?

দৈ। এখুনি তো তুমি বলেছ এতে তোমার বিশেষ আনন্দ আছে, আমি সেই আনন্দের ভাগ নেব।

কা। আনন্দ কি ভাগ করা যায়?

দৈ। যায়।

কা। কি করে?

দৈ। একসঙ্গে কাজ করে।

কা। কাজ ছাড়া আর কিছুতে আনন্দ নেই?

দৈ। আছে, তাতে ছুটি নেই।

কা। কাজের মধ্যেই কেবল ছুটি?

দৈ। হাঁ, সঙ্গে সঙ্গেই ছুটি।

কা। ছুটির কাজ কেমনতর?

দৈ। ভার বওয়া, শুধু কেবল ভার বওয়া, পৃথিবীর ভার বুকে তুলে নিয়ে পৃথিবীকে হাল্কা করা, পৃথিবীকে হাল্কা করলেই পৃথিবী তোমাকে হাল্কা করবে।

কা। পৃথিবী হাল্কা হলে কি হবে?

দৈ। পৃথিবীর বুকে আনন্দ খেলতে থাকবে।

কা। ছুটি তাহলে আনন্দেরই, আমার নয়?

দৈ। আনন্দে তোমাতে তফাৎ কি!

কাপালিকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ জোরে নাড়া দিয়ে উঠল, সে উঁচু গলায় বলে উঠল, "আনন্দ আমি এক?"

দৈ। হাঁ।

কা। তাকে পাওয়া যাবে এই পৃথিবীর কাজে?

দৈ। হাঁ, তুমিই তো এখুনি বলেছ মুর্দ্দাফরাসের কাজে তোমার বিশেষ আনন্দ আছে।

কাপালিক অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে বলল, "আনন্দের রূপ কি সন্ন্যাসিনী?"

স। "আলোক, শান্তির রূপ যেমন অন্ধকার আনন্দের রূপ তেমনি আলোক! পুলকিত হয়ে কাপালিক বলে উঠল "দাও তুমি যোগ দাও আমার কাজে, আমার আনন্দের ভাগ নাও। আমার আনন্দ তোমার হোক, তোমার আনন্দ আমার হোক, আমার সত্তা তোমার সত্তা মিলে এক হয়ে যাক্।

দৈ। এইটুকুই আমার বাকী ছিল, এর জন্যেই অপেক্ষা।

কাপালিকের হাত পা চোখের বাঁধন খুলে দিয়ে দৈবপ্রভা তার হাত ধরে তাকে বাইরে এনে দাঁড় করাল, তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল "আমাকে কেমন দেখছ?"

কা। সুন্দর, অতি সুন্দর, আশ্চর্য্য সুন্দর।

দৈ। নিজের অস্তিত্বকে কিরূপে অনুভব করছ ?

কা। শান্ত চিরদিনের মত শান্ত।

দৈ। পৃথিবীর রূপ কেমন দেখছ কাপালিক ?

কা। আনন্দ কেবলই আনন্দ।

দৈবপ্রভা কাপালিকের পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করে বলল "আমি সুব্রতা।"

কাপালিক একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল—

সৌন্দর্যে আকাশ পৃথিবী প্লাবিত হয়ে গেছে।

সাঁঝের পাড়ি

১

তুফান জাগান নদী, তার বুকের উপর দিয়ে প্রতিদিন একখানা খেয়া নৌকা আসা যাওয়া করে। ঝড় বাদল মানে না, ঝাঁ ঝাঁ রোদে ডরায় না, ঘূর্ণায় পড়ে কখনো পাক খায় না; অনায়াসে নৌকাখানা যায় আর আসে। ভোর, দুপুর, সাঁঝে, দিনে তিনবার তাকে আসতে যেতে দেখা যায়। কালা বুড়ো মাঝিটি তার হাল ধরে বসেই আছে। দুই পারের মানুষরা চেয়ে চেয়ে দেখে খেয়া বোঝাই লোক নিয়ে সকাল দুপুর সাঁঝে মাঝি পাড়ি দিচ্ছে।

সবাই তাকে কালা-মাঝির খেয়া বলে। নামটি মাঝির কালাচাঁদ কি কানে সে কালা বলে খেয়ার এই নামকরণ বোঝা যায় না। শুধু কালামাঝি আর কালামাঝির খেয়া লোকে এই জানে।

কালামাঝির বাড়ী কোথা কেউ দেখেনি, কে আছে কেউ শোনেনি। পারাপারের লোকেরা আজন্ম যেন তাকে খেয়ার উপরেই দেখেছে। বয়স তার আশী বছর

হবে। বেঁটে খাটো কালো চেহারার মানুষটির শরীর এখনো মজবুত কত। এত বয়স কোমর একটু ভাঙেনি, পিঠ একটু বাঁকেনি। কানটা কেমন করে গেছে কে জানে, চোখের দৃষ্টির তেজ এখনো খুব, দূরের জিনিষ মাঝি খুব দেখতে পায়। কানের কাছে চেঁচিয়ে বল্লে শুনতেও কিছু কিছু পায় দেখা গেছে।

খেয়ার পারাণী তার একটি করে পয়সা। ষাট বছর মানুষ পিছু একটি পয়সা নিয়ে মাঝি খেয়া বাইছে।

এই নদীর বুকে কত নূতন নূতন খেয়া দেখা দিল, লোপ পেল, ভাঙ্গলো, গড়ল, কালামাঝির খেয়া অটুট। চিরকাল সে এই খেয়াই বাইছে। বছর অন্তর একবার কেবল ফাটা ফুটো সেরে নেয়, তিন বছরে একবার রঙ দিয়ে এটাকে নূতন করে তোলে।

খেয়াখানা আগে কি কালামাঝি আগে, লোকে ভেবে পায় না। এদের ছাড়াছাড়ি কেউ কখনো দেখেনি। কালামাঝিকে বুকে করে নদীর তলা থেকে হঠাৎ একদিন খেয়াখানা যেন নদীর বুকে ভেসে উঠেছে এমনি মনে হয়।

কতকাল ধরে কত মানুষ যে এই খেয়ায় পারাপার হয়েছে কে তা গুণতে পারে? কালামাঝির মুখখানা দেশশুদ্ধ লোকের চেনা। তার মুখ ভরা হাসি বুকভরা খুসী না দেখেছে কে, খুসী না করেছে কাকে?

বছরখানেক ধরে একরাশ ফুল বোঝাই একটা ডালা

মাথায় নিয়ে কালামাঝির খেয়ায় ছোট্ট একটি মেয়েকে নিত্যি পারাপার হতে দেখা যায়। মেয়েটি দিব্যি ফুট-ফুটে সুন্দর, বয়স বছর নয়, নাম সুরভি, সবাই তাকে সুরী বলে ডাকে। সে এ পারের চিন্তে মালির মেয়ে।

বাপের বাগানের ফুল ডালি ভরে নিয়ে রোজ সে ওপারে বেচতে যায়; দুপুরের খেয়ায় গিয়ে সাঁঝের খেয়ায় এক টাকা পাঁচসিকে নিয়ে ফেরে।

প্রতিদিন আসতে যেতে সুরীর সঙ্গে কালামাঝির খুব ভাব হয়েছে। মাঝি সুরীকে খুব ভাল বাসে; সুরীও তাকে কম ভালবাসে না। মাঝি কানে শোনে না সুরী তবু চেঁচিয়ে চেঁচিয় তার সঙ্গে কত কথাই কয়! পাড়ার মেয়েদের কত গল্প, পুতুল খেলার, ঘাটে নাইতে যাওয়ার গল্প, বাপের বাগানে কত রকমের ফুল গাছ আছে কত করে সে গাছের যত্ন নিতে হয়, তার বাপ কত নূতন রকমের মালা গাঁথতে জানে, মা কেমন সুন্দর ফুলের পাখা তৈরী করে, ঘরের চালে কটা চড়াইয়ের বাসা আছে এই রকম কত গল্পই সে করে।

কালামাঝি কতক শুনতে পায় কতক পায় না। নিজের সব মনটা জাগিয়ে সে সুরীর কথা শোনে, বুদ্ধির সবটা দিয়ে তার কথা বুঝতে চেষ্টা করে তাই কথাগুলো পুরোপুরি কানে গিয়ে না পৌঁছলেও প্রাণে গিয়ে যেন পৌঁছয় বলে বোধ হয়।

কিছুদিন থেকে কালামাঝি পারাণীর পয়সাটি সুরীর কাছে নেয় না। সুরী বলে কেন মাঝি পয়সা নেবে না, পয়সা না হলে তোমার চলবে কিসে? মাঝি বলে "রোজ আমি কত পয়সা পাই একটা পয়সাতে আমার কি আসে যায়? তোমার কাছে পয়সা নিতে আমার একটুও ভাল লাগে না। পয়সাটি নিয়ে তুমি যা খুসী কোরো, যাকে খুসী দিও, বাবাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না।

সুরী বলে কি মজা, একটা করে পয়সা আমার নিজের, এটা নিয়ে আমি যা খুসী করবো।

সাতদিনের পয়সা জড় হলে কোনোবার সে পুতুলের বিয়েতে খরচ করে, কোনোবার চারটে পয়সা জমলেই সঙ্গিনীদের মুড়ি বেগুণী কিনে খাওয়ায়, কোনোবার ছোট ভাইটির জন্যে ওপার থেকে কাগজের ফানুষ, রঙকরা টিনের বাঁশি কিনে আনে. কখনো বা দু একটা পয়সা কানা খোঁড়াকে দেয়।

কালামাঝির দেওয়া পয়সাটির উপর সুরীর বড় দরদ। রোজ রাতে ঘুমবার আগে সুরী ভেবে রাখে পরদিনের পয়সাটি সে কিসে খরচ করবে। সুরীর পয়সা পাওয়ার খবর শুনে চিন্তে মালি বল্ল, "সুরী, তুই মাঝিকে রোজ একটা করে ফুল দিস, শুধুই পয়সা নিবি তার বদলে মাঝিকে তুই কিছু দিবিনে, খুসীতে সুরীর মুখখানা যেন ঝলমলিয়ে উঠল, সে তাড়াতাড়ি বল্‌ল ঠিক বলেছ বাবা

কাল থেকে খুব বড় একটা করে ফুল নিয়ে রোজ আমি মাঝির কানে গুঁজে দেব মাঝিকে বেশ দেখাবে।

পরদিন থেকে দেখা গেল, কালা মাঝি খেয়া বাইছে, তার কানে একটা ফুল গোঁজা।

সুরী একদিন মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল "মাঝি, তোমার কে আছে ?"

মা। কেউ নেই।

সু। তোমার ঘর কোথা মাঝি ?

মা। এই খেয়াখানার বুকে।

সু। দিন রাত নদীর কোলে এই খেয়ার বুকে তুমি পড়ে থাক মাঝি ?

মা। হাঁ।

সু। মাঝি তোমার রাঁধে কে ?

মা। কেউ না।

সু। খাও কি ?

মা। বাজারে কিনে।

সু। একদিন ও রাঁধা ভাত পাও না ?

মা। তিরিশ বছর পাইনি।

সু। তিরিশ বছর আগে কে রাঁধত ?

মা। আমার বউ ছিল।

সু। আর কে ছিল ?

মা। তোমার মত একটি মেয়ে।

সু। তারা এখন কোথায় ?

মা। "স্বর্গে," এই বলে মঝি আঙ্গুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে দিল।

সু। ওখানে তারা কেমন করে থাকে, ওখানে কি ঘর আছে ?

মা। এখন কি আর তারা মানুষ আছে যে ঘরে থাকবে, এখন যে তারা দেবতা হয়ে গেছে। দেবতারা আকাশের মধ্যে বেশ থাকতে পারে!

সু। আকাশের দেবতারা হাঁটে কিসের উপর দিয়ে মাঝি ?

মা। বাতাসের উপর দিয়ে।

সু। তুমি তাদের দেখ্‌তে পাও ?

মা। হাঁ।

সু। তোমার চোখের দৃষ্টি অতদূর যায় কেমন করে মাঝি ? আমিত ওখানে কিছুই দেখ্‌তে পাইনে।

মা। মনের চোখ না ফুটলে ওখানে কিছু দেখতে পাওয়া যায় না, তুমি ছেলে মানুষ তোমার তো মনের চোখ এখনো ফোটে নি!

সু। কবে ফুটবে মাঝি ?

মা। বড় হলে।

সু। আমার মা বড় হয়েছেন তাঁর তাহলে মনের চোখ ফুটেছে ?

মা। বলা যায় না, বড় হলেই হয় না, ব্যথা পাওয়া চাই, ব্যথা পেলে মনের চোখ আপনি ফুটে ওঠে।

সু। তুমি বুঝি খুব ব্যথা পেয়েছিলে মাঝি ?

মা। হাঁ, আমার খুকী যেদিন আমাকে ছেড়ে আকাশে উড়ে গেল সেদিন ব্যথায় আমার বুকটা একেবারে নুয়ে পড়েছিল, তার পরেই আমার মনের চোখটা ফুটে উঠল, মনটা আমার বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশিয়ে গেল আর আমি সেখানকার সব দেখতে পেতে লাগলুম।

সু। কি দেখতে পেলে মাঝি ?

মা। এই আকাশের মধ্যে আমার খুকীর মত মুখ। আকাশটা আমার বুক আর তোমার মুখখানা ঠিক্ যেন আমার খুকীর মুখ।

সু। সত্যি, মাঝি সত্যি, আমার মুখখানা ঠিক তোমার খুকীর মুখের মত ?

মা। ঠিক্ অবিকল ঠিক, সেই মুখ যেন তোমার মুখে বসানো।

সুরি আগ্রহের সঙ্গে বলে উঠল তার নাম কি ছিল মাঝি ?

মা। রুক্মিনী, আমরা তাকে রুনি বলে ডাকতুম।

সুরি ঔৎসুক্যের সঙ্গে মাঝির কোলের কাছে ঠেসে গিয়ে বসল, কোলের উপর হাত দুটি রেখে বল্‌ল মাঝি কাল

তোমার জন্যে আমি ভাত রেঁধে নিয়ে আসব তুমি খাবে ত ? মাঝি বলল "হাঁ খাবো বই কি ?"

পরদিন সুরী মাঝির জন্যে ভাত তরকারী রেঁধে নিয়ে এল, ; খেয়ার বুকে বসে বসে কালামাঝি সুরীর দেওয়া ভাত বড় তৃপ্তি করেই খেল।

এ বছর পূজোতে কালামাঝি সুরীকে খুব ভাল একখানা কাপড় কিনে দিয়েছে।

২

বছর ঘুরে এল একদিন তুপুরে, খেয়ায় পার হতে এসে সুরী কালামাঝিকে বলল মাঝি কাল রাতে আমাদের গাঁয়ে একজন বাউল এসেছে, সারাক্ষণ সে একতারা বাজিয়ে গান করছে, পাড়া সুদ্ধ লোক গান শোনবার জন্যে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, এখনো গান হচ্ছে, আমি শুনে এলুম ; বাউল বলেছে আমাদের গাঁয়ে সে কিছুদিন থাকবে ; সকালে এইখানেই গাইবে, তুপুরের খেয়ায় রোজ পারে গিয়ে, গান গেয়ে, সাঁজের খেয়ায় আবার ফিরবে। হয়ত বা আমাদের খেয়াতেই সে আসা যাওয়া করবে মাঝি। মাঝি বল্ল, "হুঁ"।

কিছুক্ষণ পরেই দূরে যেন একতারার সুর শোনা গেল। ক্রমেই সুর এগিয়ে আসছে, কাছে ক্রমে আরো কাছে এইবার বাউলকে দেখা গেল, ছেঁড়া আলখাল্লা

পরা, গৌরবর্ণ, দাড়িওয়ালা লম্বা মানুষটি জোরে জোরে একতারার তারে ঘা দিচ্ছে আর গাইছে—

একটি তারে বারে বারে
ডাকছে আমায় কে,

গানের এই কলিটিই ফিরিয়ে ফিরিয়ে বাউল বিশবার গাইতে লাগল, শেষে ধরল

"দ্বারে দ্বারে ফিরতে যে চায়
তারে ফিরায় কে ?

বাউল গাইছে

দিনে দিনে কাছে টানে
বাড়ায় না সে দূর,
কালে কালে কোনো জালে
জড়ায় না যে সুর।
একটি কথায় একটি ব্যথায়
সুরটি সাধায় সে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বাউল খেয়ার কাছে এসে পড়ল একটি পয়সা মাঝির হাতে দিয়ে খেয়ায় চড়ে বসল। গানটা এখন থেমেছে, বাউলকে বস্‌তে দেখে সুরী বলে উঠল "গাও না বাউল।

বাউল বল্ল তুমি গান ভাল বাস ?

সু। হাঁ।

বা। তুমি গাইতে পার ?

সু। না বাউল, আমি মোটেই গাইতে পারিনে, একটি গানও আমি জানিনে, আমাদের পাড়ার মালতীমালা আর মুক্তকেশী গাইতে পারে, তারা রোজ বলে আমাকে শেখাবে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত একটাও শেখায়নি। বাউল বল্‌ল "তুমি গান শিখবে? আমি তোমাকে শেখাব, তুমি রোজ সকালে আমার কাছে যেও"।

সুরী উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল "কাল থেকে রোজ তোমার কাছে ঠিক্ যাবো, ভোরে উঠেই যাব, "তুমি অনেক গান জান বাউল, না"?

বা। হাঁ ঢের জানি।

সু। গান তুমি ঢের জান কিন্তু বাজনা বুঝি তোমার এই একটি?

বা। হাঁ, এই একটি বাজনার একটি তারেই আমি সব গান বাজাতে পারি।

সু। কেমন করে বাউল?

বা। তোমাকে শিখিয়ে দেব, তাহলেই তুমি বুঝবে কেমন করে বাজে।

সুরী মহাখুসী, সে গান শিখবে, একতারা বাজাবে, সঙ্গিনীদের শোনাবে, খুব মজা হবে।

খেয়ার যাত্রীরা বাউলকে ঘিরে বস্‌ল, সুরী একমনে গান শুনছে। বাউল গাইছে—

দ্বারে দ্বারে ফিরতে যে চায়

তারে ফিরায় কে ?

একটি কলি বাউল কতবার যে ফিরিয়ে ফিরিয়ে গায়, যেন সুর দিয়ে নিজের বুকের ভিতরটা সে মেজে নিতে চায়, কোন কিছু ছোঁয়ালেই বুকটা যেন বেজে ওঠে, যেন সাড়া দেয়।

বাউল গাইছে—

দিনে দিনে কাছে টানে
বাড়ায় সে দূর,
কালে কালে কোন জালে
জড়ায় না যে সুর,

সজোরে তারের উপর ঝঙ্কার দিয়ে বাউল গেয়ে উঠল

একটি কথায় একটি ব্যথায়
সুরটি সাধায় সে।

জোরে জোরে তারের উপর ঘা দিচ্ছে আর বাউল গাইছে

একটি কথায় একটি ব্যথায়
সুরটি সাধায় সে।

খেয়া এসে পারের ঘাটে ভিড়ল। যাত্রীরা নেমে যে যার পথে গেল চলে, যাবার সময় সকলেই দুএকটা করে পয়সা বাউলকে দিয়ে গেল।

সাঁঝের খেয়ায় সুরী দেখল বাউল ও তাদের সঙ্গে ফিরছে। সুরী ভাবল, কি মজা! সে সা

ভেবেছে তাই; বাউল ও তাদের সঙ্গে আসা যাওয়া করবে।

রোজ তারা যায়, সাঁঝে ফেরে; সুধীর গল্প, বাউলের গান, কালামাঝির হাসি হাসি মুখ খেয়ার বুকটাকে আজ কাল কেমন জমিয়ে রাখে, পারাপারের লোকেরা বড় খুসীতেই পার হয়।

কালামাঝির খেয়ায় আজকাল খুব ভীড়। তার খেয়ায় যাবার জন্যে লোকেরা ঘাটে এসে ঠেলাঠেলি করতে থাকে। যারা একটু আগে আসে তারাই গিয়ে খেয়ায় চড়ে বসে, বোঝাই হলেই মাঝি খেয়া ছেড়ে দেয়।

কালামাঝি আগের চেয়ে ঢের বেশী লোক এখন খেয়ায় বোঝাই করে তবুও সকলকে ধরাতে পারে না। যারা পড়ে থাকে তীরে দাঁড়িয়ে খেয়াখানার দিকে চেয়ে চেয়ে তারা দেখে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাউলের গান শোনে, মনে ভাবে কাল আমি সকলের আগে এসে খেয়ায় চড়ে বসব।

বাউলের সঙ্গে, সুধীর, কালামাঝির খুব ভাব। খেয়া ছাড়বার একঘণ্টা আগে ওরা ছুজনে এসে খেয়ায় বসে থাকে। খেয়ার বুকে ওরা যেন নিজেদের ভাবের ঘর বেঁধেছে। এইখানে বাউলের গান, সুধীর গল্প, কালামাঝির প্রাণের খুসী বুকের ভিতর থেকে যেন উথলে পড়ে—সবাইকে টানতে থাকে।

৩

আকাশে অল্প অল্প মেঘ করেছে, নদীর বুকে বাতাস উঠে খেয়াখানাকে অল্প অল্প দোলাচ্ছে, কালামাঝি হাল ধরে বসে, খেয়ার বুকে বাউল আর সুরী ; এখনো পাড়ি দেওয়ার সময় হয়নি,—একঘণ্টা দেরী আছে। বাউল ধীরে ২ একতারাতে ঘা দিচ্ছে আর নিজের মনে গুন্ গুন্ করে গাইছে—

আমার এই একটি তারের
একটি কড়ি দর।

দূর থেকে দেখা গেল তাড়াতাড়ি পা ফেলে একটি লোক যেন খেয়া ঘাটের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই সে এসে উপস্থিত হল, পা দুটো ধুলোয় ভরা, মাথার চুল উস্‌কে খুসকো, মুখখানা শুকিয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি যেন কাকে খুঁজছে ; লাল কাপড়ের তৈরী একটা খোলের মধ্যে একটা লম্বা ধরণের জিনিষ ভরা—জিনিষটা বাদ্যযন্ত্র বলে বোধ হয়—সেইটা হাতে নিয়ে লোকটি তীরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল "এদিকে বাউল এসেছেন ?"

খেয়ার উপর থেকে বাউল বল্ল, কেন ভাই বাউলকে তোমার কি দরকার ?

লো। বড় দরকার, তাঁর একতারার সুরটা আমাকে

এতদুর পর্য্যন্ত টেনে এনেছে, ঐ সুরটিতে আমার বড় দরকার।

বা। উঠে এস ভাই উঠে এস, খেয়ার বুকে উঠে এস ; খেয়ার বুকে বসে সুর শুনবে এস। সুরের খেলা শোনবার এই তো ঠিক জায়গা ; তুমি সুর চেন দেখছি।

লো। সুর নিয়েই যে আমার কারবার, আজীবন সুরের খেলা নিয়েই আমি আছি,—অন্য কাজ নেই। কত বড় বড় ওস্তাদের সঙ্গে ফিরেছি, সুরের কত আশ্চর্য্য খেলা শুনেছি, শেষে সর্ব্বস্ব ব্যয় করে এই বীণাটি কিনেছি নিজে বাজাব বলে,—ঘরে বসে যখন ইচ্ছা সুর শুনবো বলে,—আজ আমার বীণায় সুর নেই।

বা। কেন কি হয়েছে ভাই তোমার বীণার ?

লো। জড়িয়ে গেছে, তারে তারে জড়িয়ে গেছে, নতুন বীণাটি কিনে সুর বেঁধে যেমনি বাজাতে যাব, অমনি তারে তারে জড়িয়ে গেল। বীণায় আমার দুটি মাত্র তার, সেই দুটিতে এমন করে জড়িয়ে গেছে যে কেউ তাকে খুলতে পারছে না। কত ওস্তাদের কাছে গেলুম, কতজনকে দেখালুম, কেউই খুলতে পারল না। বীণা নিয়ে পথে পথে পথে ফিরছি বাউল, কেউ আমার জড়ান তার খুলে দিতে পারছে না। আজ একতারের সুর শুনে তোমার পিছু পিছু ছুটে আসছি ঐ সুরটা আমার বীণায় একবার বাজিয়ে দাও বাউল।

বী। "একতারের পথ তোমাকে কে দেখিয়ে দিল বীণকর?"

বী। "রাস্তায় এক ফকিরের সঙ্গে দেখা, সে বল্লে বাউলের কাছে যাও, বাউলের একতারের ঝঙ্কার নিজের বীণার তারে লাগিয়ে নাও, পাক খুলে তার আপনি বেজে উঠবে। অনেক ঘুরে এসেছি ভাই বাউল অনেক ঘুরেছি, একতারার সুরটা দয়া করে আমার দুইতারায় লাগিয়ে দাও, বীণা বেজে উঠুক।"

খুসী হয়ে বাউল হাত ধরে বীণ্‌করকে খেয়ায় তুলে নিল, কাছে বসিয়ে বল্‌ল, ভাই বীণকর! একতারের সুরটা আগে কানে শুনে, প্রাণে চিনে নাও তবে তাকে দুইতারে বাজাতে পারবে। তুমি তো সুর চেন?"

বী। চিনি বই কি!

বা। "সুরের মাঝে মাঝে ফাঁক আছে জান তো, যেখানে এসে সুর শেষ হয়?"

বী। জানি বই কি!

বা। "লোকে মনে করে সেই ফাঁকটা বুঝি শুধুই ফাঁকা, তার বুঝি আর কোন সুর নেই, কিন্তু সেই ফাঁকের যে মস্ত বড় একটা সুর আছে সেটা সবাই জানে না।"

বী। সে সুর কোথায় কেমন করে বাজছে বাউল?

বা। "জগতের বুকের ঠিক মাঝখানটিতে সে দিন-

রাত বাজছে ; বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, শ্রান্তি নেই, ক্লান্তি নেই সে বাজছেই বাজছেই বাজছেই। সে এক হৃদয় হরা বৈরাগ্য ভরা সুর, সে চিরফাঁকের সুর।"

বী। সে সুর ধরে রাখছে কে ?

বা। বাউলের একতারা, সেই সুরই বাউলের একতারাতে বাজে, উদাসীর প্রাণকে আরও উদাস করে, আপনি বেজে জগতের সব সুরকে নিজের নিজের জায়গায় বাজবার চির অবকাশ দেয়। এই ফাঁকের সুরটা বাজাতে না জানলেই সুরে সুরে জড়িয়ে যায় হে বীণকর তারে তারে জড়িয়ে যায়। ফকির তোমাকে এই ফাঁকের সুরটাই শিখতে বলেছে।'

বাউলের কথাশুনে বীণকর আনন্দে বলে উঠল, "বাজাও, ভাই বাউল বাজাও, তোমার 'একতার' আমার জড়ান বীণার তারে একবার ফাঁকের সুরটা লাগিয়ে নিই।" এই বলে থলের ভিতর থেকে সে নিজের বীণাটা বের করতে লাগল।

এদিকে যাত্রী বোঝাই হয়ে কালা মাঝি খেয়া ছেড়ে দিয়েছে। সুরী এতক্ষণ হাঁ করে বাউলের কথা শুনছিল, খেয়া ছাড়তেই বলে উঠল "এইবার গাও না বাউল।" বাউল গান আগেই ধরেছে—

আমার এই একটি তারের
একটি কড়ি দর,

একতারা বাজছে, বাউল গাইছে—

'দুনিয়ার সকল সুরের
এই সুরেতে ভর।'

যাত্রীরা বাউলের কথা, বাউলের গান, একতারার ঝঙ্কার মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে শুনছে, বাউল গাইছে—

বাজে সে একটি ফাঁকে,
সাড়া দেয় একটি ডাকে,
বাঁধে সে সকল সুরের
মাঝখানে তার ঘর।'

আকাশে মেঘ জমে উঠেছে, সেদিকে কারো নজর নেই, সকলের মন সুরের দিকে ; বীণকর একটি আঙ্গুল দিয়ে জড়ান তারের উপরই কিড়িং কিড়িং করে ঘা দিচ্ছে,—ফাঁকের সুরটা লেগে, পাক খুলে, যদিই বীণা বেজে ওঠে।

হঠাৎ কালা মাঝি বলে উঠল "আজ আকাশের গতিক খারাপ, ঝড় উঠবে হে।" কেউ সে কথায় কান দিল না, একতারার ঝঙ্কারে সকলের মন ডুবে আছে।

তারে ঘা দিতে দিতে বীণকর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "পাক খুলেছে হে বাউল আমার জড়ান তারের একটা পাক খুলেছে।"

বা। "তা তো খুলবেই ; ফাঁকের সুরটা লাগাতে পারলেই পাক্ খুলবে ; ফাঁকটা বজায় রেখে সুর

খেলাতে শিখলেই স্বর্গ মর্ত্ত্য একসঙ্গে বাজবে। তোমার বীণার সেইটাই কাজ।

তারে বীণকর ঘা দেয় আর পর্দ্দায় পর্দ্দায় পাক্ খোলে। সে ফাঁক বজায় রেখে তার বাজাতে শিখেচে। ক্রমেই তার খুলে আস্‌ছে—বীণকরের বুকের ভিতরটায় যেন আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল, সে থামে না, ঝনন্ ঝনন্ করে কেবলই তার বাজায়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে খেয়া এসে পারের ঘাটে ভিড়ল, যাত্রীরা নেমে গেল। বীণকরের বীণার জড়ান তার খুলে গেছে; ফাঁক বজায় রেখে সুর বেঁধে নিয়ে আনন্দে বীণা বাজাতে বাজাতে সে বাউলের সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল।

বাউল গাইতে গাইতে যাচ্ছে—

একতারাতে ঘা দিয়ে কে
পথ কেটে যায় মধ্যখানে,
পিছিয়ে পড়ে এধার ওধার
এগিয়ে সে যায় সমুখ পানে।
ঐ দেখা যায় বিরাম তাহার
মাঝ পথের ঐ শেষ কিনারে,
একতারাতে বাজছে গো তার
চিরফাঁকের সেই চিনারে।

বীণকর, বাউল, গাইতে, বীণ শোনাতে গাঁয়ের মধ্যে গেল, সুরী গেল ফুল বেচতে, কালামাঝি একলা বসে

রইল খেয়ার বুকে। আকাশে খুব মেঘ, মাঝি চেয়ে চেয়ে তাই দেখ্‌ছে।

৪

সাঁঝের পাড়ির সময় এখনো হয়নি, একটু আগেই আজ সবাই এসে জুটল,—আকাশের গতিক দেখে। সুরী, বাঁশকর, বাউল, সবাই এসেছে—অন্য যাত্রীও ঢের। কালামাঝিও আজ একটু সকাল সকাল খেয়া ছাড়বে— আকাশে মেঘের খুব ঘটা।

হালটি কালামাঝি ফেরালো তীর থেকে খেয়া খানা ভেসে এল জলের দিকে। মাথা উঁচু করে সবাই একবার আকাশের দিকে তাকাল। মাথার উপর কি কালো মেঘ! একজন যাত্রী বলে উঠল, "ও বাবা মেঘের ঘটা দেখ, খেয়াখানা পেরতে পারলে হয়, মাঝ নদীতে তুফান না জাগে, কে জানে কপালে কি আছে!" লোকটা কালামাঝির খেয়ায় আজ নূতন উঠেছে। পুরোণ যাত্রীরা দু একজন বলে উঠল "ভয় নেই হে ভয় নেই, মাঝি বড় পাকা, বড় হুঁসিয়ার, কত ভয়ানক তুফানে সে আমাদের পার করেছে, জান না তো? এ কালামাঝির খেয়া এ খেয়ায় উঠলে কোনো ভয় থাকে না।

কালামাঝির সুখ্যাতি শুনে সুরীর মুখখানা খুসীতে ভরে উঠল। সে কালামাঝির হাঁটু ধরে নাড়া দিয়ে

বলল" মাঝি, সবাই বলছে কালামাঝির খেয়ায় কোন ভয় নেই, তোমাকে ওরা জানে।"

মা। "তোমার চেয়ে বেশী জানে না।"

সু। "আমি বুঝি তোমাকে খুব বেশী জানি ?"

মা। "হাঁ, খুব বেশী, সব চেয়ে বেশী ; তুমি আমার সব জান।"

সু। বলত কি কি জানি আমি গুণে গুণে দেখি।

এই বলে সুরী আঙ্গুলে এক, দুই, গুণতে লাগল, মাঝি বলে যাচ্ছে—কোথায় থাকি, কোথায় শুই, কি খাই, কখন খাই, কখন শুই, ঘর কোথা, আছে কে, রাঁধে কে, খুকীর খবর, খুকীর মায়ের খবর, তাদের আকাশে থাকার খবর, সব খবরই তুমি জান, এত কি আর কেউ জানে ?

সু। "সত্যি মাঝি, আমি তোমার সব জানি, আমার মত কেউ জানে না ; তোমার কাছে থাকতে তাই আমি এত ভাল বাসি মাঝি !

"ভালবাস বলেই আমার সবটা নিয়ে আমাকে এমনতর ফাঁকা করে দিয়েছ। আমার ফাঁকা বুকটাতে এখন নদীর জল 'ছলাৎ' 'ছলাৎ' করে এসে ঢোকে, খেয়াখানা আসতে যেতে আমার বুকের মধ্যে কেমন গান গায় !"

সু। কি বল মাঝি, খেয়া আবার কখনো গান গাইতে পারে ?

মা। বাউলকে জিজ্ঞাসা কর সকাল, দুপর, সাঁজে খেয়া গান গায় কি না?

সুরী মাঝিকে ছেড়ে বাউলের দিকে ফিরে বল্‌ল "বাউল দাদা! মাঝি বলচে খেয়া গান গায়; সত্যি?"

বা। হাঁ দিদি, খেয়া আসতে যেতে দিন রাত গান গায়।

সু। তোমাদের কথা কিছুই বোঝা যায় না, কি যে তোমরা বল!

বাউল বীণকরেব দিকে ফিরে বলল কালা মাঝির বুকে সুর বাজে ভাই বীণকর! আসতে যেতে খেয়া তার বুকে সুর বাজায় শুনলে তো?"

বী। "তাই তো শুনছি, অশ্চর্য্য ব্যাপার, সুরের যে কোথায় শেষ কে জানে?"

বা। "শেষ ঐ ফাঁকের মধ্যে, ফাঁকের সুরটা কানে এখনো ভাল করে বসেনি বলে ওটা ধরছে পারছ না, আরো শুনতে হবে হে আরো শুনতে হবে।"

বী। ভাই বাউল! তোমার একতারাটা একবার বাজাও ভাই, ভালো করে ঐ সুরটা প্রাণের মধ্যে বসিয়ে নিই।

গানে বাউলের শ্রান্তি নেই।

একতারায় ঘা দিয়ে সে তখুনি গান সুরু করল।

ওরে ও ক্ষ্যাপা বাউল

মিছে তুই মরিস্ ঘুরে,
তারে তোর বাজছে যে সুর
সেই সুরে নে পরাণ পুরে।

বীণা রেখে দিয়ে একমনে বীণকর গান শুনছে, সুরটা আজ সে প্রাণে বসিয়ে নেবে।

বাউল গাইছে

'ওরে ও ক্ষ্যাপা বাউল
মিছে তুই মরিস ঘুরে।'

নদীর বুকে তুফান জেগেছে, ঝড় এসে পড়ল বলে, মেঘে আকাশ ঘেরা।

খেয়াখানা একবার এদিকে কাৎ হয় একবার ওদিকে; উল্টে গেল আর কি! ছোট ছেলেরা ভয়ে চীৎকার করে ওঠে, বড়রা তাদের ধরে থেকে সামলায়।

কালামাঝি অটল, হাল ধরে সে বসেই আছে, মুখে ভয়ের চিহ্ন মাত্র নেই, এর চেয়ে কত ভারী তুফানে সে পাড়ি দিয়েছে এতো আর তুলনায় কিছুই নয়। এটুকু তুফান সে গ্রাহ্যই করে না।

সুরী কালামাঝির পায়ের কাছে বসে, খেয়া কাৎ হলেই ভয় পেয়ে সে কালামাঝির হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে। কালামাঝি বলে "ভয় পাচ্ছ?" সুরী বলে না, কই ভয় পাচ্ছি! কালামাঝি হাসতে থাকে।

তুফান ঠেলে মাঝি পাড়ি দিচ্ছে। কি তার পাড়ি

দেওয়ার কায়দা। তুফান যতই উঠুক খেয়া ঠিক আছে। তুফান দেখে বাউলের প্রাণে কি আনন্দ! সে গলা ছেড়ে গান ধরেছে, কোন দিকে চোখ কান নেই, একতার বাজছে বাউল গাইছে—

ওরে ও ক্ষ্যাপা বাউল
মিছে তুই মরিস ঘুরে
"তারে" তোর বাজছে যে সুর
সেই সুরে নে পরাণ পুরে।

বাউলের আনন্দ দেখে কে? তুফানের দিকে সে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছে আর গাইছে—

আছে পথ একটি জানা
গেছে সুর একটি শোনা
দেখে নে জগত খানা
বাজছে কোথায় একের সুরে।

বাউলের প্রাণের আনন্দ খেয়া খানার বুকে যেন ছড়িয়ে পড়ল। তুফানের ভয় ভুলে সবাই এখন গানের সুরে ডুবে গেল। গান শুনতে সবাই মন দিয়েছে হঠাৎ একটা শব্দ হল 'ফোঁস' তার পরেই ঝপাৎ করে জলে একটা কি পড়ে গেল। সকলে অন্যমনস্ক, সেদিকে কারো কান গেল না। খানিক পরে আবার সেই শব্দ 'ফোঁস', ঝপাৎ করে আবার যেন জলে কি একটা পড়ল!

এইবার সকলের চোখ পড়ল সেদিকে। এক চুবড়ি

সাপ নিয়ে একজন বেদে খেয়ায় পার হচ্ছিল, ডালা ঠেলে, মাথা উঁচিয়ে দুবার দুটো সাপ চুবড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে জলে পড়ল এ তারই শব্দ।

রাগে গস্‌গস্‌ করতে করতে চুবড়ি ধরে বেদে ঝাঁকাচ্ছে আর বক্‌ছে, "আঃ গেল যা, সাপ গুলোর হয়েছে কি, ভারি যে জ্যান্ত হয়ে উঠেছে দেখছি, দু দুটো সাপ পালিয়ে গেল, আবার আমাকে কষ্ট করে জঙ্গল থেকে সাপ ধরে পোষ মানাতে হবে; এদের কত করে শিখিয়েছিলুম।"

চুবড়িতে সাপ চারটে ছিল, দুটো পালিয়েছে বাকি দুটোও স্থির থাকছে না, ঝেঁকে ঝেঁকে উঠছে।

বেদের হাতে একটা বাঁশি ছিল, তাই দিয়ে সাপ দুটোর মাথায় ঘা দিতে দিতে সে বল্‌ল চুপ্‌ থাক বেটা চুপ্‌ থাক্‌, নড়বিনে চুপ্‌ থাক্‌।

ঘা খেয়ে তখনকার মত সাপ দুটো গুটি সুটি মেরে চুবড়ির মধ্যে লুকোলো, সাপুড়ে বাঁশীতে ফুঁ দিল।

সাপুড়ের বাঁশির সুরে সাপ মুগ্ধ হয়ে বশ মানে; বাঁশী পোঁ ধরল, বেদে নিশ্চিন্ত হয়ে বাঁশী বাজাতে লাগল আর সাপদের পালাবার যো নেই সে জানে।

বাউলের একতারা বাজছে, গান চলছে তার ভিতরে সাপুড়ের বাঁশীর পোঁ পোঁ আওয়াজটা সকলেরই কানে

কেমন বেখাপ ঠেকতে লাগল। বাউল সে দিকে কান দেয়নি, সে নিজের মনে গেয়েই যাচ্ছে—

ওরে ও ক্ষ্যাপা বাউল
মিছে তুই মরিস্ ঘুরে,
'তারে' তোর বাজছে যে সুর
সেই সুরে নে পরাণ পুরে,
আছে পথ একটি জানা
গেছে সুর একটি শোনা,
দেখে নে জগৎ খানা
বাজছে কোথায় একের সুরে।

সাপুড়ের বাঁশীর পোঁ পোঁ সুর তখনো বাজছে, সকলে ত্যক্ত হয়ে উঠল্। যাত্রীদের মধ্যে একজন বলে উঠল্ "কি হে বেদে তোমার পোঁ পোঁ থামবে না; দেখছ না একতারা বাজছে।"

বেদে চটে উঠে বল্ল "বলেন কি মশায় দু দুটো সাপ পালিয়ে গেল আমার কি কম ক্ষতি হল, ঐ একতারার সুরটাই তো সাপগুলোকে বিগড়িয়ে দিচ্ছে। সাপেরা অন্য সুর সইতে পারে না। বাঁশীর সুর শুনে তবে একটু চুপ্ করে আছে"।

কথা কইতে গিয়ে বেদে অন্যমনস্ক হয়েছ সেই অবসরে ঝপাং করে আর একটা সাপ্ লাফিয়ে জলের মধ্যে পড়ল।

বেদে রেগে জ্ঞান শূন্য হয়ে বাউলকে তেড়ে উঠে বল্‌ল তোমার একতারের সুরের জ্বালায় আমার সব সাপগুলো পলিয়ে গেল, কি তুমি ফড়াং ফড়াং তড়াং তড়াং সুর বের করছ, আমার সর্ব্বনাশ করে ছাড়লে ?”

গান থামিয়ে বাউল বল্‌ল “কি ভাই বেদে কি হয়েছে তোমার ?”

বে। আর কি হবে সর্ব্বনাশ হয়েছে।

বা। কেমন করে ?

বে। তোমার একতারার সুরের জ্বালায় পোষা সাপগুলো আমার সব পালিয়ে গেছে।

বা। ওরা প্রাণ পেয়েছে ভাই বেদে প্রাণ পেয়েছে, এতে দুঃখু কোর না।

বে। তবে তো বড় কাজই হয়েছে ওরা প্রাণ পেয়েছে, ওরা প্রাণ পেল তো আমার কি, আমার যে এদিকে সর্ব্বনাশ হয়ে গেল তার কি হবে ?

বা। যার প্রাণ তাকে তো সেটা ফিরিয়ে দিতে হবে। নিজের প্রাণ নিজে ফিরে পেলে অন্যের যদি তাতে সর্ব্বনাশ হয় তবে তেমন সর্ব্বনাশ তো ঘটাতেই হবে ; সৃষ্টি তা না তো বাঁচবে কি করে ?

বে। রেখে দাও তোমার ওসব ভালো কথা, যেমন আমার সাপ গেছে তেমনি তোমার একতারাটা কেড়ে নিয়ে তবে আমি ছাড়ব।

বা। এই নাও আমার একতারা বাজিয়ে যতপার পয়সা রোজগার কোরো।

বে। তা দেবে না কেন, জানছ ওটা আমার হাতে বাজবে না, তাই তাড়াতাড়ি দিতে এসেছ, সে হবে না, আমার সাপের দাম দিতে হবে তবে ছাড়ব।

বাউলের আলখাল্লার পকেটে সেদিনকার পাওয়া যে কটি পয়সা ছিল পকেট থেকে সেগুলি বেদেকে দিয়ে বাউল তাকে নিজের কাছে বসাল। বাকি সাপটা বেদের চুবড়ি থেকে ইতিমধ্যে কখন লাফ মেরে পালিয়েছে কেউ দেখেইনি। ঝগড়া কর্ত্তে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে চুবড়ির ডালাটা বেদে খুলে রেখে গিয়েছিল।

পয়সা পেয়ে বেদে খুসী হয়েছে। গলা স্বরটা একটু নরম করে বাউলকে বলল, "ভাই বাউল আবার আমাকে অনেক কষ্ট করে জঙ্গল থেকে সাপ ধরে এনে পোষ মানাতে হবে; সে কম কষ্ট নয়।"

বা। সাপ নিয়ে কি করবে ভাই বেদে?

বে। খেলাব।

বা। মানুষ কি সাপ নিয়ে খেলে, সে যে বিষের খেলা।

বে। আমরা বিষকে ভয় করিনা।

বা। ভয় করনা কিন্তু বিষের হাত থেকে বাঁচতে ও তো পার না।

বে। বেঁচে তো থাকি।

বা। সে সাপ হয়ে, মানুষ হয়ে নয়, সাপের সঙ্গে মিল্‌তে মিল্‌তে সাপ হয়ে যাও, মানুষ থাক না।

বে। মানুষ হয়ে বাঁচতে গেলে কি নিয়ে থাকতে হয়?

বা। সুর নিয়ে, সুরের খেলাই মানুষের খেলা; বিষ নিয়ে খেলবে সাপ, মানুষ নয়।

বে। সাপগুলো তাহলে থাকবে কোথায়?

বা। জঙ্গলে, গর্ত্তে, আর এই নদীর জলে; লোকালয়ে নয়।

বাউলের কথায় বেদের মনটা যেন একটু ভিজে গেল। সে বল্ল এটা আমার জাতব্যবসা, এ না হলে আমার চলবে কিসে?

বা। ভুলে যাও এমন ব্যবসা।

বে। জাত যাবে যে।

বা। যেতে দাও।

বে। কি নিয়ে থাকব?

বা। সুর নিয়ে।

বে। সাপ খেলাতেও সুর আছে, আমরা বাঁশী বাজাই তবে সাপ খেলে।

বা। সে বাঁশী বিষের বাঁশী, সে সুর মোহের সুর ও বাঁশী বাজাতে বাজাতে নিজের বুকেও বিষ ঢুকে যায়

ও সুর শুনতে শুনতে নিজেকেও মোহে ডুবিয়ে ফেলে।

বে। আমার তবে কি হবে ভাই বাউল, এ ছাড়া আর কোন সুর তো আমি জানিনে, গলায় আমার সুর আসে না, হাতে আমার সুর বাজে না, সুর আমি পাব কোথায় যে তাই নিয়ে থাকব ?

বা। খেয়া বাও, সকাল দুপুর সাঁজে খেয়া বাও ভাই দেখে সুর আপনি বেজে উঠবে।

বে। খেয়া বাইলে কি সুর বাজে বাউল ?

বা। হাঁ, খুব বাজে, আশ্চর্য্য সুর বাজে।

বে। কি বলছ বাউল ! আমরা তো খেয়ার আসা যাওয়ায় কোন সুর শুনতে পাইনে।

বা। মনের কাণ নেই শুনবে কি করে, মনের কাণ না খুললে এ সুর শোনা যায় না।

বে। "তুমি শুনতে পাও ?"

বা। "হাঁ।"

বে। "তোমার মনের কান খুললো কি করে ?"

বা। "একতারের সুর শুনতে শুনতে; এ সুর কানের ভিতর দিয়ে প্রাণে গিয়ে পৌঁছলেই মনের কান আপনি খুলে যায়——পৃথিবী জুড়ে যেখানে যত সুর বাজছে সব শোনা যেতে থাকে।

বে। 'খেয়া বাইলে একটি সুর শোনা যায়, না অনেক ?'"

বা। "একটি সুরই নানা রকমে অনেক বার শোনা যায়, এর যাওয়ায় সুর, আসায় সুর, ভাসায় সুর, উজানে সুর, তুফানে সুর, খেয়া বাওয়ার আগা গোড়াই সুরের খেলা। কালামাঝির কান নেই তবু এই সুরটা তার প্রাণে গিয়ে বসেছে, তাই তার প্রাণটা এমন খুশীতে ভরা মুখখানা এমন হাসি হাসি।"

বে। "খেয়া বাওয়াতে কড়ি ও আছে ভাই বাউল, এখন থেকে আমি তাহলে খেয়াই বাইবো। তোমার কাছেই থাকতে হবে, আমার জাত যাবে, ঘরে তে আমাকে নেবে না।"

বা। চমৎকার হবে ভাই বেদে চমৎকার হবে। বেদে বাউলের কথা খেয়ার যাত্রীদের এতক্ষণ এমন ভুলিয়ে রেখেছিল যে কখন তুফান কেটে গেছে তার টেরই পায়নি। আকাশ পরিস্কার, দু একটা তারা দেখা দিয়েছে, কালামাঝির মুখের হাসি এইবার আরো যেন ফুটে উঠেছে, সে হাস্‌তে হাস্‌তে সুরীকে বল্‌ল, "কি খুকী তুফান কোথায় গেল?"

সু। কে জানে,—তুমি এখুনি বল্‌বে আকাশে মিশিয়ে গেছে।

মা। তাই গেছে।

সু। বেশ মাজোক্, সব জিনিষ বুঝি আকাশে মিশিয়ে যায়?

মা। হাঁ, সব।

সু। আর সব জিনিষ আসতে যেতে গান গায়, —তুমি ও বল বাউল দ.দাও বলে।

মা। গানের খবর বাউলই বেশী জানে, আমি কেবল একটি সুর বুকের মধ্যে শুনি—খেয়া আসতে যেতে যেটি বাজায়। কানটা যে আমার কালা, আমি কি বেশী সুর শুনতে পাই? প্রতিদিন খেয়া বাই তাই খেয়ার সুরটা কান ডিঙ্গিয়ে কোন রকমে আমার বুকে এসে পৌঁচেছে!

খেয়া এসে এপারে মাটিতে ঠেক্‌ল, যাত্রীরা আনন্দে চীৎকার করে উঠল—

বেঁচে থাক ভাই কালামাঝি বেঁচে থাক, আজ বড় তুফানেই আমাদের পার করেছ।

মা। আমি কি পার করেছি ভাই দেবতা করেছেন, দেবতার হাতেই সব।

যাত্রীরা নেমে পড়ল, বাউলকে ঘিরে তারা গাঁয়ের পথে এগোতে লাগ্‌ল, বাউল গাইতে গাইতে যাচ্ছে—

খুলে দে মনের ঠুলি,
রেখে দে দুয়ার খুলি,
কে আসে দেখরে চেয়ে আকাশ বেয়ে
কণ্ঠে সুরের তুফানে তুলি।

বাউলের হাত ধরে সুরো যাচ্ছে। যেতে যেতে সে

কালামাঝির দিকে ফিরে ফিরে দেখ্‌ছে আর ভাবছে রাতটা কালামাঝির কেমন করে খেয়ার বুকে কাটবে!

৫

গত রাতে নদীতে বান এসে অর্দ্ধেক খানা গাঁ প্রায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। গরু, বাছুর, ছাগল, ঘরের চাল, গরিবের ছেঁড়া কাঁথা, গৃহস্থের বাসন পত্র, অনেক দিনের জড় করা ধান চাল কত যে লণ্ডভণ্ড হয়ে, বানের জলে ভেসে চলে গেছে কে তা গুণবে?

ভোরের সময় জল সরে গিয়ে নদী আবার ঠিক আগের মত স্থির। রাতে যে অমন প্রলয়কাণ্ড ঘটে গেছে এখন নদীর চেহারা দেখে তা একটুও বোঝবার যো নাই। ডাঙ্গার দিকে নির্লজ্জ ভাবে কটাক্ষ করতে করতে নদী এখন হেসে হেসে চলেছে—যেন সে কিছুই জানে না। যত সব ভাঙ্গা চোরা ছেঁড়া কাটা নোংরা ময়লা জিনিষ, বুকে নিয়ে ডাঙ্গা খানা যেন কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কেউ তার দিকে চেয়ে না দেখলেই ভাল হয়। কাদা ভেঙ্গে একটি ছোট্ট মেয়ে নদীর তীরে ছুটোছুটি করছে দেখা গেল।

ঘাটের কাছেই, তিন জন মানুষ একখানা খেয়া ধরে টানাটানি করছে, খেয়াখানা কাদার উপর উল্টে পড়ে আছে, সেটাকে টেনে এনে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা।

খানিক টানাটানি করতেই খেয়াখানা কাৎ হল, তার তলায় একটা মানুষ শুয়ে, মানুষটা মরা।

ছোট্ট মেয়েটি দৌড়ে খেয়ার কাছে এসে চেঁচিয়ে উঠল—"কালমাঝি!"

দুনিয়ার দেনা

১

গাঁয়ের রাস্তা ধরে একটি প্রবীণ গোছের ভদ্রলোক চলেছেন ; হাতে ছোট্ট একটি চামড়ার ব্যাগ, পরণে থানের ধুতি, গায়ে ফর্সা পাঞ্জাবী, কাঁধের উপর মটকার চাদর একখানা ভাঁজ করে ফেলা, পায়ে সাধারণ দিশি জুতো, মাথায় একটা অল্প দামের ছাতা।

ভদ্রলোক ছাতাটি মাথায় দিয়ে ডান হাতে ছাতার বাঁটটি ধরে বাঁ হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে যাচ্ছেন।

দেখ্লেই মানুষটির উপর শ্রদ্ধা জন্মায়, দিব্যি সুন্দর, শান্ত, সৌম্য চেহারা, বয়স আন্দাজ ষাট বাষট্টি।

কাছেই স্টেশন। বোধ হল, তিনি স্টেশনে নেমে রাস্তা ধরেছেন। পথ দিয়ে একলাই চলেছেন, সঙ্গে কোন লোক নেই।

সরু লালমাটির রাস্তা এঁকে বেঁকে গাঁয়ের ভিতর পর্য্যন্ত চলে গেছে। যতদূর চোখ যায়, একপাশে বরাবর ধানের ক্ষেত, আর একপাশে অনেকখানি পতিত জমি মাঝে ঐ সরু পথটি। কিছুদূর এগোতেই বাবুটি দেখতে

পেলেন, একজন গেঁয়ো লোক মাথায় একটা বোচকা নিয়ে সেই পথ ধরে চলেছে। খালি গা, মোটা একখানা ধুতি পরা, পায়ে ভারি গোছের একজোড়া চটি, কাঁধে গামছা ফেলা, হৃষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ লোকটি নিজের মনেই এগিয়ে যাচ্ছে কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

বাবুটি কাছাকাছি হতেই সে একটু থমকে দাঁড়াল। তাকে থামতে দেখে বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কতদূর যাবে হে ?

সে বল্ল, এই গাঁটা ছাড়িয়ে বাবু, আপনি কদ্দুর যাবেন ?

বা। এই গাঁয়েরই কেবলরাম সর্দ্দারের বাড়ী।

লো। ওঃ! আপনি বুঝি গাঁয়ের জমিদার পুরন্দর চক্রবর্ত্তী! প্রণাম হই, প্রণাম হই! কিছু মনে করবেন না মশায়—আগেই প্রণাম করা উচিত ছিল।

বা। তুমি আমায় জানলে কেমন করে ?

লো। আপনার নাম না জানে কে ? চোখেই আপনাকে দেখিনি নামতো শুনেছি।

বা। চিনলে কেমন করে ?

লো। কেবল সর্দ্দারের বাড়ী যাবেন শুনে, আর ঐ চেহারা দেখে, চেহারাটা কি একেবারেই ঢাকা থাকে মশায়!

তিনি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লেন, তোমার ঐ

সদানন্দ মূর্ত্তিখানিও তো চমৎকার, নামটি শুনতে পাই কি ?

লো। আমার নাম সনাতন মুদি।

বা। বাড়ী কোথা ?

লো। এই গাঁ খানা পেরিয়ে সামনের গাঁয়ে।

বা। গাঁয়ের জমিদার কে ?

লো। হরশঙ্কর দে।

বা। গাঁ খানার অবস্থা কেমন ?

লো। আর বলবেন না মশায় দুঃখের একশেষ, দুঃখের একশেষ।

বা। কিসের কষ্ট ?

লো। জমিদার গাঁ খানার দিকে একবার ফিরে ও তাকায় না। প্রজারা রোগে ভুগে, না খেয়ে, পচা পুকুরে নেয়ে, দুবেলা জোড়া জোড়া মরছে, রাস্তার দুর্গন্ধে পথ চলা ভার। জল কষ্ট, অন্নকষ্ট কোন কষ্টের আর বাকি নেই।

বা। জমিদার মশায়কে জানান উচিত।

লো। জানাব কি, তিনি কি কখনো গাঁয়ে আসেন ? একি আপনি যে প্রজাদের ঘরে ঘরে ঘুরে দেখবেন কার কি কষ্ট কার কি অভাব, না আপনার মত গাঁয়ে স্কুল বসাবেন, কত গেঁয়ো চাষার ছেলে লেখা পড়া শিখে মানুষ হয়ে গেল আপনার কৃপায়। তাদের গোলা ভরা ধান,

গোয়াল ভরা গরু, ঘরে ঘরে মরাই বাঁধা. তার উপর তারা ডাক্তারী শিখছে, আইন পড়ছে—এটি রাম রাজ্য আপনার এটি রাম রাজ্য। কতলোক আমাকে বলে এ গাঁ ছেড়ে তুই পুরন্দর বাবুর গাঁয়ে গিয়ে বাস কর, সে কিন্তু আমি পারি না মশায় যে গাঁয়ে জন্মেছি সে গাঁ ছাড়তে পারিনে। মরতে হয় তো গাঁ শুদ্ধ সবাই মরব, বাঁচিতো সকলেই বাঁচব। একলা বাঁচতে চাইনা মশায় নইলে কবে আপনার জমিতে এসে ঘর বাঁধতুম।

জন্মস্থানের উপর সনাতনের টান দেখে জমিদার বাবু অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও একটু আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন, "নমস্কার, সনাতন নমস্কার! তোমাকে পেয়ে তোমার জন্মস্থান ধন্য হয়েছে দেখছি।"

স। "ধন্য টন্য জানিনে মশায়, ছাড়তে পারিনে এই সোজা কথা। দেনা মশায় দেনা, বেজায় দেনা, গাঁয়ের কাছে আমার বেজায় দেনা ছাড়ি কেমন করে ?,, বাবুটি ভাবলেন, মুদির বুঝি ঢের দেনা আছে, তাই তার গাঁ ছেড়ে আসা সম্ভব হয় না। তিনি বল্লেন, 'কত দেনা হে চুকিয়ে দিলে আসতে পারত চুকিয়ে দেওয়া যায়।'

মু। সে অনেক দেনা, বাবু, অনেক দেনা। সে চুকোবার নয়, শেষ হবার নয়। সে মায়ের দেনা, গাঁয়ের দেনা, দাইয়ের দেনা, গাইয়ের দেনা, ঘরের দেনা, বাইরের দেনা, জলের দেনা, মাটির দেনা, ছেলের দেনা, বুড়োর দেনা

গাঁ শুদ্ধ লোকের দেনা হাওয়াটার পর্য্যন্ত দেনা, চাওয়াটার পর্য্যন্ত দেনা। এত দেনা কে চোকাবে ? অসম্ভব অসম্ভব !

শেষের এই কথা গুলো শুনে জমিদার বাবুর কেমন কেমন ঠেকতে লাগল। একবার মনে হল লোকটা পাগল নয়ত এসব কি বলে ? আবার মনে হল এসব কথার কোন গভীর অর্থ নেইত ?—বোঝা শক্ত।

পথ ফুরিয়ে এল, সামনেই কেবল সর্দ্দারের বাড়ী। বাবুকে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে নিজের মনে বক্‌তে বক্‌তে মুদি চলে গেল ; পুরন্দর চক্রবর্ত্তী একটা পাড়ার মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

পাড়াটা চাষাদের বেশী ভাগ লোকই চাষী। কয়েক ঘর তেলি মালি কুমর কামার কৈবর্ত্ত যারা আছে তারা নিজের নিজের জাত ব্যবসা করে থাকে।

পুরন্দর চক্রবর্ত্তীর বাপ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এই জমিদারী খানা কেনেন। তাঁর সময়ে ও তিনি এর যথেষ্ট উন্নতি করে গেছেন কিন্তু তাঁর ছেলে পুরন্দর যেমন সব ছেড়ে এই নিয়েই রয়েছেন এমনটা পূর্ব্বে কখনো হয়নি। এখন এর এতটা উন্নতি হয়েছে যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পুরন্দরের বাপ একালের সকল শিক্ষাই ছেলেকে দিয়েছেন। পুরন্দর হাইকোর্টের উকিল আবার মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষা পাস করা ডাক্তার কবিরাজীও কিছু কিছু জানেন। কিন্তু এসব ব্যবসার দিকে না গিয়ে জমিদারীর

উন্নতি নিয়েই তিনি পড়ে আছেন। একখানি চিকিৎসার ও একখানি আইনের ছোট বই ছাপিয়ে গাঁয়ের ছেলে মেয়েদের স্কুলে পড়ানর ব্যবস্থা করেছেন যাতে এ বিষয়ে তারা অজ্ঞ না থাকে। নিজে সম্পূর্ণ একেলে হয়ে ও সেকালটিকে পুরন্দর ষোল আনা নিজের মধ্যে বজায় রেখেছেন। বেশভূষা চাল চলন দেখে তিনি সহুরে কি পাড়াগেঁয়ে বোঝা দায়। চার পুরুষ তাঁদের সহরে বাস গেঁয়ো আনাড়ী ভাব তাঁরা অনেক দিন ছাড়িয়ে গেছেন আবার সৌখিন সহুরে চাল চলনও ঢের মন্থন করে এসেছেন কোন দিকে তাঁর কমতি নেই; এখন তিনি এ দুয়ের উপর। গাঁয়ের লোক তাঁকে বাবা ঠাকুর বলে ডাকে।

ঝকঝকে তকতকে মেজেটা পাকা করে বাঁধানো, খোড়ো চালের একখানা বড় গোছের মাটির বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে, দরজার বাইরে থেকে, পুরন্দর চক্রবর্ত্তী হাঁকলেন, কেবলরাম!

সাড়া পেয়ে আধাবয়সী চাষী কেবলরাম হরিণ চামড়ার একখানা আসন হাতে করে, ব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। কেবলরামের বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ হবে, বেশ সুশ্রী সুন্দর চেহারা। রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, লম্বা, দোহারা গড়ন চাল্ চলন অত্যন্ত ভদ্র, নম্র ও শিষ্টাচার যুক্ত। একে দেখ্‌লে আর বলবার যো নেই যে, "গেঁয়ো চাষা ভুত।" বাড়ীতে তার গাইগরু দশটা,

বাছুরও অনেকগুলো, বলদ তিন জোড়া। পঞ্চাশ বিঘে জমিতে চাষ। বাড়ীর লোক অভাব কাকে বলে জানে না।

ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে আসনখানা পাততে পাততে কেবলরাম বল্লে, "বাবা ঠাকুর, বসুন।" পুরন্দর বল্লেন, "না হে, এখন বস্‌বো না, আগে ঘুরে আসা যাক্, কাজ সারা হোক্ আগে।"

কেবলরাম তখন আসন খানা তুলে রেখে, হাতে একটা মোটা লাঠি নিয়ে, বেরলো। আগে পুরন্দর চক্রবর্ত্তী, পিছু কেবলসর্দ্দার।

পথে যেতে যেতে, পুরন্দর জিজ্ঞসা করলেন, "কেবলরাম সনাতন মুদিকে চেন হে ?"

কে। তাকে আবার চিনিনে।" তাকে না চেনে কে ? পাঁচখানা গাঁয়ের লোক সবাই তাকে চেনে। সে এক পাগল বাবা ঠাকুর ! সকাল থেকে রাত পর্যান্ত বক্‌ছে 'দেনা মশায় দেনা, আমার বেজায় দেনা, বেজায় দেনা।' এ ছাড়া তার মুখে আর কথা নেই, সকল কথার শেষে এই কথাটা বল্‌বেই। আর নিজের মনেও অনেক সময় একলা একলাই বক্‌ছে দেখা যায় 'দেনা মশায় দেনা, আমার বেজায় দেনা, মশায়, আমার বেজায় দেনা।'

পুরন্দর। লোকটা করে কি ?

কে। মস্ত বড় একখানা মুদির দোকান আছে, তাই চালায়। দোকানখানা তিন পুরুষের, ওরা তিন পুরুষ ধরে এই মুদির ব্যবসা করে আসছে।

পু। ওর কি কিছু দেনা আছে? হয়ত দেনার দায়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই দিনরাত ঐ রকম বকে বেড়ায়! খবর নেওয়া দরকার হে।

কে। না বাবা ঠাকুর, মোটেই তা নয়, ওর বাপ দাদা ব্যবসা করে ঢের সম্পত্তি করে রেখে গেছে কিছুরই অভাব নেই, ওটা ওর পাগলামি, ঐ রকম বকা ওর বাতিক। সনাতনের নিজের মা নেই' দাই মা তাকে মানুষ করেছে। দাই মা বলে, ওর বয়েস যখন ষোল বছর, তখন এক সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ে, ওর এই রকম মাথা খারাপ হয়ে যায়। বছর খানেক সন্ন্যাসীর পিছু পিছু ঘুরে, যখন বাড়ী ফিরল, তখন দেখা গেল আপনার মনে দিনরাত বকছে "দেনা মশায় দেনা, বেজায় দেনা, মায়ের দেনা গাঁয়ের দেনা, দাইয়ের দেনা, গাইয়ের দেনা, ছেলের দেনা বুড়োর দেনা ইত্যাদি কত কি বকে। আপনি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা কইলেই বুঝতে পারবেন, ব্যাপারটা কি!

পু। আমি তার সঙ্গে কথা কয়েছি।

কে। কোথায়?

পু। আজ, রাস্তায়।

কে। কেমন বুঝলেন ?

পু। তোমরা যতটা পাগল তাকে ভাবছ, ততটা নয়।

কে। কিন্তু ঐ রকম বলাটা তো তার পাগলামী ?

পু। তাও নয়।

কে। তবে কি ?

পু। এর ভিতরে ওর একটা জ্ঞান আছে, কোন কারণে মাথাটা খারাপ হয়ে যাওয়ায়, তার সঙ্গে ঐ জ্ঞানটা জড়িয়ে গিয়ে, ওকে ঐ রকম বকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধু পাগলামী নয় হে।

কেবলসর্দ্দার খানিক চুপ করে থেকে বল্লে,"তা হতেও পারে, সনাতন যতটা পাগলের মত বকে তার কাজ গুলো কিন্তু ততটা পাগলের মত নয়। কাজ যা করে, তা খুব উঁচুদরের বাবা ঠাকুর।

পু। "আমি তো বলেইছি ও ঠিক পাগল নয়।"

"ওদের সারা গাঁ খানাকে সনাতনই যা কিছু বাঁচিয়ে রেখেছে। জমিদার, নায়েব, গোমস্তা এক একটি ধুরন্ধর, কেবল প্রজার গলায় ফাঁসি দিয়ে টাকা আদায় করে, একবার ও প্রজার দুঃখের দিকে ফিরে দেখে না। সনাতন না থাকলে, গাঁ খানা এতদিন উজাড় হয়ে যেত।"

পু। "আমি তো বলেইছি ওর ভিতর জিনিষ আছে, জ্ঞান আছে হে ওর ভিতর জ্ঞান আছে।"

কে। "তা হতেই পারে, গাঁয়ের ছেলে বুড়ো যে অশক্ত যে দুঃখী, সারাদিন যে কোন কারণে খেতে পায়নি তেমন প্রত্যেককেই সনাতন রোজ সন্ধ্যার সময় সিধে মেপে দেয়। আর গাঁয়ের যার বাড়ীতে যত গরু আছে তারা খাওয়াতে না পারলে বিচালী ভূসী যা দরকার সব নিজের দোকান থেকে পাঠিয়ে দেয়। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলে গাইয়ের কাছে যে আমার অনেক দেনা' তার দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছি, জান না?"

পু। "দেখলে তো হে, আমি তো বলেইছি ওর জ্ঞান আছে।"

"সনাতনের জমি জায়গা ঢের। জমির উপর তার কি যত্ন। নিজে সমস্ত জমি তদারক করে, কোথাও এক ফোঁটা পচা জল দাঁড়াতে দেয় না, কোথাও একটু পচা গন্ধ বার হতে দেয় না, পাছে জমি খারাপ করে। বলে বলে, দেনা মশায় দেনা, মাটির কাছে আমার বেজায় দেনা, সে আমাকে কত অন্ন খাইয়েছে, জান না?

পু। দেখলে, কি রকম জ্ঞান?

কে। আরো তার কত কি কাণ্ড কারখানা আছে, সব জানতে গেলে তার বাড়ী যেতে হয়।

পু। যেতেই তো হবে, আজই যেতে হবে।

কে। কখন?

পু। এখুনি, তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ সেরেই।

এই বলে, সেদিনকার মত যা কিছু দেখবার শোনবার ছিল, তাড়াতাড়ি সব সেরে নিয়ে, কেবলসর্দ্দার সঙ্গে পুরন্দর সনাতন মুদির বাড়ীর দিকে চল্লেন।

ক্রোশ দুই গিয়ে পুরন্দর নিজের জমিদারীর এলাকা ছাড়ালেন। অন্য গাঁয়ে ঢুকে সনাতন মুদির বাড়ী খুঁজে নিতে তাঁদের একটুও দেরী হল না। পথে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করতেই, সে দেখিয়ে বল্লে "ঐ সনাতন মুদির দোকান।" দোকানের সামনে অত্যন্ত ভীড়, লোক ঠেলাঠেলি করছে। পুরন্দর বল্লেন, খুব তো খদ্দের হে!" লোকটা বল্লে, "হবে না মশায় পাঁচখানা গাঁয়ের লোক ওর দোকানে রোজ ভেঙ্গে পড়ে, বেজায় কাটতি, বেশী লাভ করে না কিনা? আর মেয়েরা কিনতে গেলে তো এক পয়সাও লাভ নেয় না, আসল দামে জিনিষ দেয়, জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'দেনা মশায় দেনা, বেজায় দেনা আমার মেয়েদের কাছে বেজায় দেনা। তাদের কাছে লাভ নিলে যে ডুবে মরব মশায় ডুবে মরব দোকান কি আর তাহলে থাকবে'?" পুরন্দর শুনে কেবলসর্দ্দারের দিকে চেয়ে বল্লেন "দেখলে হে কি রকম ওর আশ্চর্য্য জ্ঞান"! কেবলরাম বল্লে "হাঁ বাবাঠাকুর তাইত দেখছি, আশ্চর্য্য বটে।"

বলতে বলতে তাঁরা সনাতন মুদির বাড়ীর কাছে এসে পড়লেন। বাড়ীটার সামনের অংশে প্রকাণ্ড ঐ দোকান-

খানা ; ভিতরের অংশটা ছোট, তাতে বড় কেউ থাকে না —এক বুড়ী দাইমা ও একটি গাই গরু, আর তাদেরই সেবা যত্নের জন্যে একটা ছোকরা চাকর।

জমিদার পুরন্দর চক্রবর্ত্তী ও কেবলসর্দ্দারকে সেখানে উপস্থিত দেখে, সনাতন শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল, বল্‌ল আসুন আসুন মশায়, ভিতরে আসুন, বসুন ঐ তক্তাখানার উপরে, বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। দেনা মশায় দেনা আমার বেজায় দেনা, বেজায় দেনা মশায় আপনাদের কাছে।

পুরন্দর নত হয়ে সনাতনকে নমস্কার করে বললেন, 'আমাদের ফাঁকি দিলে চলবে না হে সনাতন, বলতে হবে এমন জ্ঞান তুমি কোথা থেকে পেলে।

স। জ্ঞান ট্যান জানিনে মশায়, দেনা কেবল দেনা। মশায় দেনা বেজায় দেনা।

পু। ওসব কোন কথা আমি শুনছিনা হে সনাতন এ জ্ঞান আমাকে দিতে হবে হে, দিতে হবে।

স। দেনা মশায় দেনা, আমার বেজায় দেনা, আমি আবার দেব কি, আমার কেবল দেনা।

তাঁরা কথাবার্ত্তা কইছেন এমন সময় হঠাৎ এক সন্ন্যাসী সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, সঙ্গে এক চেলা। সন্ন্যাসীকে দেখেই সনাতন বলে উঠল, আসুন মশায় আসুন, বসুন এই তক্তাখানার উপরে দেনা, মশায় দেনা বেজায়

আমার দেনা, আপনার কাছে ও আমার মশায় বেজায় দেনা।

সন্ন্যাসী একটু অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চাইলেন। পুরন্দর সন্ন্যাসীর মনের ভাব বুঝে বললেন ইনি পরম জ্ঞানী, কে জানে কেমন করে এঁর মাথাটা বিগড়ে গেছে, আমি এর কাছ থেকে জ্ঞান পাবার জন্যে এখানে এসে বসে আছি, আপনিও বসুন, অনেক কিছু জানতে পারবেন। সকলে তক্তার উপর উঠে বসলেন পুরন্দর জিজ্ঞাসা করলেন, দেনা তোমার কার কার কাছে হে সনাতন?

স। মায়ের কাছে, গাঁয়ের কাছে, দাইয়ের কাছে গাইয়ের কাছে, মাটির কাছে, জলের কাছে, ছেলের কাছে বুড়োর কাছে, খাওয়ার কাছে, চাওয়ার কাছে, গাঁ সুদ্ধ লোকের কাছে সবার কাছে, মশায় সবার কাছে। আপনার কাছে, সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে দেনা মশায় দেনা কেবল দেনা।

সন্ন্যাসী চুপ করে শুনছেন।

পু। মায়ের কাছে কিসের দেনা সনাতন?

স। জন্মের; মা না হলে জন্মাতুম কেমন করে?

পু। সে দেনা তুমি শোধো কি করে "হে?"

স। আসল দামে, জিনিষ গুলো মেয়েদের বিক্রি করে। তাদের কাছে খাঁটি থাকতে হবে যে মশায়?

এক পয়সা তাদের কাছে কি লাভ নিতে পারি? দেনা আমার দেনা বেজায় দেনা যে তাদের কাছে।

প্র। গাঁয়ের দেনা শোধো কি করে?

ন। গাঁয়ের জন্যে দুঃখ স্বীকার করে, দেনা বেজায় দেনা, বেজায় দেনা মশায় গাঁয়ের কাছে।

প্র। দাইয়ের দেনা?

ন। যেখানে যত বুড়ো স্ত্রীলোক আছে, খেতে না পেলে তাদের খেতে দিয়ে। তারা যে আমাকে বুকের রক্ত খাইয়েছে। দেনা মশায় দেনা, বেজায় দেনা তার কাছে।

প্র। গাইয়ের দেনা?

স। একই কথা মশায়, একই কথা, দাই আর গাই, খেতে না পেলে তাদের ও খেতে দিতে হয়। দেনা মশায় দেনা, বেজায় দেনা তার কাছে।

প্র। "মাটির দেনা শোধের উপায়?'

স। "খেটে মশায় খেটে, সারাদিন তার জন্যে খেটে, পচা জল সরিয়ে, পচা গন্ধ মরিয়ে সার ঢেলে দেদার সার ঢেলে। দেনা মশায় দেনা তার কাছে বেজায় আমার দেনা।"

প্র। "জলের দেনা সনাতন?"

স। "ভালো জল বাঁচিয়ে, পচা জল ছেঁচিয়ে, নূতন নূতন পুষ্করণী কেটে। দেনা মশায় দেনা জলের কাছে বেজায় আমার দেনা।"

পু। "ছেলের দেনা সনাতন কি করে শুধতে হবে ?"

স। ছেলে গুলোকে শিখিয়ে, সোনার দরে বিকিয়ে দেখবে চেয়ে জগৎখানা, ছেলের গায়ে ফলচে সোনা। দেনা মশায় দেনা, ছেলের কাছে আমার অনেক দেনা।"

পু। "বুড়োদের দেনা শোধের কি হবে ?"

স। "ভক্তি চাই মশায়, ভক্তি চাই, তাঁদের উপর বিশেষ ভক্তি চাই। অনেক জ্ঞান তাঁরা দিয়েছেন। দেনা মশায় দেনা, বেজায় আমার দেনা তাঁর কাছে।"

পু। "হাওয়ার দেনা চাওয়ার দেনা কি করে মেটাও সনাতন ?

স। হাওয়া আমার প্রাণ, চাওয়া আমার দান, হাওয়াকে বইতে দিয়ে, মানুষকে চাইতে দিয়ে, মশায় চাইতে দিয়ে। দেনা মশায় দেনা বেজায় আমার দেনা তার কাছে।" পুরন্দর সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে বললেন "দেখলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর, দেখলেন কি ব্যাপার, দেখলেন কি রকম পাগ্লল !"

সন্ন্যাসী চুপ করে বসে, মুখে কথাটি নেই। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে সন্ন্যাসী বললেন "সনাতন তোমার চাষে আমাকে খাটতে দিতে হবে, খানিকটা জমি আমার জন্যে বরাদ্দ করে দাও, মাটির দেনা কেমন করে শুধতে হয় আমি শিখবো।

স। "নিন ঠাকুর নিন যতখানি জমী ইচ্ছা হয় নিন,

চাষ আবাদ করুন, ফসল যা হবে সব আপনার, দেনা মশায় দেনা, আমার বেজায় দেনা মাটির কাছে, সে আমাকে কত ফসলই দেয়।"

সন্ন্যাসী। "না হে সনাতন ফসল আমি নেব না, ফসল যা হবে সব তোমার, আমি কেবল তোমার জমিতে চাষে খাটব।"

স। "দরদ চাই ঠাকুর, দরদ চাই, ফসল না নিয়ে মাটির জন্য খাটতে গেলে মাটির উপর বেজায় দরদ চাই। সন্ন্যাসীর কি মাটির উপর তত দরদ হবে?

সন্ন্যাসী। "হবে হে হবে, সন্ন্যাসী মাটির জন্যে খাটলে সন্ন্যাসটা তার পাকা হবে। দরদ না থাকে খাটতে খাটতে দরদ জন্মাবে। না জন্মায়, দেনার দায়েও তো খাটতে হবে। তুমি তো এখুনি শেখালে বেজায় দেনা আমাদের মাটির কাছে।"

স। বুঝতে পারলে হয় ঠাকুর, বুঝতে পারলে হয়, মাটি ফসল ও দেবে সন্ন্যাস ও পাকাবে এটা বুঝতে পারলে হয়। দেনা ঠাকুর দেনা, বেজায় দেনা আমাদের মাটির কাছে। পুরন্দর দুজনের কথা অবাক্ হয়ে শুনছিলেন সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সন্ন্যাসটা কি তবে একবারেই মিথ্যে, সন্ন্যাসীর জীবনটা শুধুই কি তাহলে ব্যর্থ?"

সন্ন্যাসী। তা ঠিক নয়, সন্ন্যাসীর মধ্যেও একটা সাধনা আছে। নিজের অস্তিত্বকে আর সব কিছু থেকে

ছাড়িয়ে আলাদা করে দেখার জন্যে তাঁরা সাধনা করেন, কেউ কেউ তাতে সিদ্ধি লাভও করে থাকেন, কিন্তু সে সিদ্ধি সার্থক হয় না, যদি না সেটা পৃথিবীকে দিতে পারা যায়। দিতে হবে মশায়, দিতে হবে, পৃথিবীকে সে সাধনার ফলটা দিতে হবে। আর তো একটা উপায় চাই। সনাতনের কাছে সেই উপায়টা আজ শিখলুম। সনাতনের চাষে খেটে সেই সাধনাটা আমার সার্থক করতে হবে। সনাতন ঠিকই বলেছে বেজায় দেনা মাটির কাছে। এই দেনার কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম, সনাতন সেটা মনে করিয়ে দিলে।'

পু। "সন্ন্যাসী ঠাকুর! পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিরা যে সাধনা করেছিলেন, তার কিছুই কি তাঁরা পৃথিবীকে দিয়ে যেতে পারেননি, সে সবই কি তাঁদের তাহলে বৃথা হয়েছে?"

সন্ন্যাসী। "না বৃথা হয় নি, তাঁরা সূক্ষ্মদর্শী ঋষি ছিলেন, মাটি জল প্রভৃতির সূক্ষ্ম রূপ গুলো তাঁরা দেখতে পেতেন, সেই সবের সঙ্গে নিজের সাধনাকে তাঁরা মিশিয়ে রেখে গেছেন:—আকাশে ছড়িয়ে, বাতাসে উড়িয়ে আগুনে পুড়িয়ে, জলে গলিয়ে ধূলো মাটিতে মিলিয়ে নিজের সাধনাকে তাঁরা পৃথিবীর অস্থি মজ্জার সঙ্গে একেবারে মিশিয়ে দিয়ে গেছেন। পৃথিবীর সঙ্গে সেটা মিশে আছে বলেই আজও সনাতনের মত লোক একটা আধটা

জন্মাচ্ছে। কিন্তু আমরা তো তাঁদের মত সূক্ষ্মদর্শী ঋষি নই, আমরা অন্য জাতের সন্ন্যাসী, আমাদের সাধনাটা আর এক ধাঁচের, আমরা সাধনাই করে যাচ্ছি, কিন্তু পৃথিবীকে সেটা দিতে পারছি না। দেওয়া চাই মশায় দেওয়া চাই। শুনলেন তো সনাতনের কাছে, দেনা মশায় দেনা, বেজায় আমার দেনা, সবার কাছে দেনা। নিজের দিকে চেয়ে দেখছি দুনিয়ার একটি দেনাও আমার শোধ করা হয় নি। আমাকে একেবারে গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে মশায় গোড়া থেকে, তাই মাটি থেকে সুরু করবো ভেবেছি। সনাতন শিখিয়েছে 'দেনা মশায় দেনা বেজায় দেনা মাটির কাছে'।"

পু। "প্রণাম সন্ন্যাসী ঠাকুর, প্রণাম সনাতন ভায়া, তোমাদের দুজনের কাছে আজ আমি শিখলুম 'দেনা আমার দেনা সবার কাছে দেনা, বেজায় আমার দেনা দুনিয়ার কাছে।

সনাতন এ সব কথায় কান দেয়নি, সে নিজের মনেই বকছে 'দেনা আমার দেনা, বেজায় আমার দেনা, দেনা আমার সবার কাছে।

দ্রষ্টব্য

এই লেখিকার অন্যান্য গ্রন্থ

১। জ্যোতিঃ মূল্য ।৶০

১। অকল্পিতা ,, ॥০

প্রাপ্তি স্থান

১। মোসলেম পাব্লিসিং হাউস

৩ নং কলেজস্কোয়ার কলিকাতা।

২। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

৩। ইণ্ডিয়ান পাবলিসিং হাউস

২২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

৪। শ্রীযুত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী

পোঃ শান্তিনিকেতন

জিঃ বীরভূম

E. I. R. Loop